মাননীয় শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য উপপাঠ্যরূপে অনুমোদিত
(কলিকাতা গেজেট, ১২ই এপ্রিল, ১৯৫৩)

দেশ-বিদেশের গল্প—২



প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
ফাল্গুন
১৩৬৩
২

প্রিণ্টার—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার



সূচীপত্র



বার্লিনের পথে শেষ যুদ্ধ



ইতিহাসের আগে

"ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ 'পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।"

—রবীন্দ্রনাথ

মানবজাতির ইতিহাসের বয়স মাত্র সাড়ে ছয় হাজার বৎসর। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৪২৪১ বৎসর পূর্বে মিসরদেশে পঞ্জিকার আবিষ্কার হয়। সেই সময়ের পূর্বেকার কোন ঘটনার দিনতারিখ সম্বলিত বিবরণ পৃথিবীর কোন দেশেই নাই।

কিন্তু, ইতিহাসের বয়স যতই কম হউক, মানবজাতি[illegible]ান্ত নাবালক নহে। পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বেও যে পৃথিবীতে মা[illegible]স্তিত্ব ছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে

জার্মান দেশের নিয়ান-দার্থাল উপত্যকায় যে নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, পণ্ডিতেরা তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ওটা অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে-কার মানুষের কঙ্কাল। বলা বাহুল্য কোন কোন স্থানে ইহারও পূর্বের নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।



নিয়ান-দার্থাল মানুষ

নিয়ান-দার্থাল মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি যে ঠিক বর্তমান যুগের মানুষের মত ছিল না, এ-কথাও অবশ্য পণ্ডিতেরাই বলিয়াছিলেন। ইহাদের মাথার গঠন এরূপ যে তাহার ভিতরে মস্তিষ্ক বলিয়া কোন বস্তু থাকিত বলিয়া ধারণা করা বেশ কঠিন। কপাল ও চোয়াল সংকীর্ণ ছিল, হাত ও পা এমন অস্বাভাবিক ধরণের ছিল যে এখনকার মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়ানো বা চলা ইহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইত বটে, কিন্তু পরস্পরে কথাবার্তা

বলিবার মত ভাষা ইহাদের জানা ছিল না। ইহারা লাঠির ব্যবহার জানিত এবং পাথরের সাহায্যে অনেক কাজ করিতে পারিত।

ভাষার অভাব না থাকিলে ইহারা হয়ত সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের পথে আগাইয়া যাইতে পারিত এবং নিজেদের মিলিত চেষ্টায় হিংস্র জন্তু ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহাদের, জন্তু-জানোয়ারের মত দুই একটি অর্থহীন আওয়াজ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাহাদের গলা দিয়া বাহির হইত না। ফলে, জন্তু-জানোয়ারের মতই বনে বনে একাকী জীবন কাটাইতে তাহারা বাধ্য হইত।

নিয়ান-দার্থাল মানব জার্মানী হইতে লোপ পাইল কেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শুধু জার্মানী নহে, সমগ্র পৃথিবী হইতেই ঐ পর্যায়ের 'অপ-মনুষ্য' জাতিরা কোন এক অজানা নবযুগের প্রভাবে ক্রমশঃ লোপ পাইয়া গেল। শুধু আবার 'অপ-মনুষ্য' জাতিরাই নহে, প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুসকলও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল।

স্থলে ও জলে যে স্তেগোসাউরাস, দিপ্লোদোকাস, জাইগান্তোসোরাস্ জন্তু সকল ঘুরিত, আকাশে উড়িয়া যে তেরো-ড্যাক্‌টিল উক্ত বিরাট জন্তুদেরও ভয়ের কারণ হইত, তাহারা ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। তাহাদের কঙ্কাল এখনও মাঝে মাঝে মাটির তলায় পাওয়া যায়। কোনটা হাতী অপেক্ষা বহু গুণে বড়, কোনটা তালগাছের সমান উঁচু, কাহারও সাপের মত লম্বা গলা, কাহারও আবার করাতের মত দাঁতের পাটি! তাহারা নাকি আবার পরস্পরের সঙ্গে সদা-সর্বদা যুদ্ধে রত থাকিয়া পৃথিবীটাকে ভয়াবহ এক

রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়া রাখিত। শক্তি ছিল তাহাদের অসীম, কিন্তু প্রকৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা পারিয়া উঠিল না—পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।



ষ্টেগোসাউরাস

হিমবন্যা

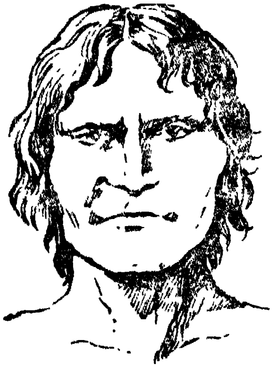
ভূপৃষ্ঠেও তখন সদা-সর্বদা নানা পরিবর্তন দেখা যাইত। আধুনিক যুগের লোক আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের সহিত পরিচিত। সেই প্রাচীন যুগে অগ্নিস্রাবের চেয়ে সহস্রগুণে মারাত্মক এক উৎপাত ছিল মেরুমণ্ডলের হিমবন্যা। মেরু-পর্বতের শিখরদেশ ধ্বসিয়া পড়িত

সমতল ভূমির উপরে, শত শত যোজন সমতল ভূপৃষ্ঠ সুগভীর তুষার-বন্যার নীচে দীর্ঘদিনের জন্য ডুবিয়া যাইত। জীবজন্তু ত' মরিতই, উদ্ভিদ-জগৎও ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পাইত না। কালক্রমে, হয়ত শত শত বৎসর পরে, সেই তুষার-আবরণ গলিয়া নদীর আকারে সমুদ্রের দিকে বাহির হইয়া গেলে, তখন তাহার নীচে হইতে প্রকাশ পাইত পৃথিবীর এক নূতন রূপ। ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তিত, বহু জীব বিলুপ্ত, নূতন সৃষ্টি সূচনার জন্য পৃথিবী ব্যাকুল!

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জীবজন্তু ও বিভিন্ন 'অপ-মনুষ্যে'র বিলোপের জন্য এই হিমবন্যাগুলিই প্রধানতঃ দায়ী। ইউরোপ মহাদেশের ভূ-স্তরসমূহ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন যে, অন্যূন সাতটি প্রলয়ঙ্করী হিমবন্যা একের পর এক উত্তর সমতল অঞ্চলকে যুগে যুগে বিধ্বস্ত করিয়াছে। ইহার ভিতর চারিটি আসিয়াছিল মেরুমণ্ডল হইতে, তিনটি ইউরোপের মেরুদণ্ড স্বরূপ সেই প্রাচীন পর্বতমালা হইতে, যাহার ক্ষীণ ভগ্নাবশেষ এক্ষণে আল্পস্ গিরিশ্রেণী নামে পরিচিত।

এক একটি হিমবন্যার পরে পরিবর্তিত পৃথিবীতে মানব জাতির এক একটি নূতন রূপ দৃষ্ট হইয়াছে। নিয়াম-দার্থালের পরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল কিচেন-মিদেন মানব জাতি। ডেনমার্ক এবং জার্মানীর উত্তর প্রান্তে ইহাদেরও কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা কাঁকড়া-জাতীয় এক প্রকার মাছ খাইত। যুগ যুগ ধরিয়া সেই মাছের খোলা ইহারা গ্রামের প্রান্তসীমায় ফেলিয়া রাখিত, ফলে সমুদ্র-

তীরের সমান্তরাল ভাবে মাইলের পর মাইল ধরিয়া উঁচু জাঙ্গালের



ক্রো-ম্যাগ্‌নন মানুষ

সৃষ্টি হইয়াছিল। এখনও ঐ সব জাঙ্গাল বর্তমান রহিয়াছে।

নিয়ান-দার্থাল এবং কিচেন-মিদেনেরা ছিল আকারে খর্ব। তাহাদের পরে যে মনুষ্যজাতি উত্তর ইউরোপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাদের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগ্‌নে। এই সব মনুষ্য ছয় ফুটের উপরে লম্বা হইত, এবং ইহাদের মস্তকের গঠন দেখিয়া অনুমান করা যায় যে মস্তিষ্কের দিক দিয়াও ইহারা অনেকটা উন্নত ছিল।

নব-প্রস্তর যুগ

এই ক্রো-ম্যাগ্‌নন ও ইহাদের সমপর্যায়ের মানবগোষ্ঠীরা ক্রমশঃ আদিম-প্রস্তর যুগ অতিক্রম করিয়া মধ্য-প্রস্তর যুগে, এবং আরও পরে মধ্য-প্রস্তর যুগ অতিক্রম করিয়া নব-প্রস্তর যুগে উপস্থিত হইল। এই সময়ে ইহারা অগ্নির আবিষ্কার করিয়াছে, গুহার ভিতরে পারিবারিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং প্রস্তর হইতে কুঠারাদি অস্ত্র নির্মাণ করিয়া পশু হত্যা করিতে সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শীত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পশুচর্মের দ্বারা দেহ ঢাকিতেও ইহারা শিক্ষা করিয়াছে।

পশুহনন হইতে এক ধাপ অগ্রসর হইলেই পশুপালনের পর্যায়। গরু, মেষ এবং ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নব-প্রস্তর যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মাংস এবং দুধ ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য, ভারবহনের জন্যও ইহারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ মানুষ ঘোড়ায় চড়িতেও শিখিল। ঘোড়ায় চড়িয়া সে দূর পথ অল্প সময়ে অতিক্রম করিল। অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিয়া পরক্ষণেই ঘোড়ায় চড়িয়া নিরাপদ স্থানে পলায়নের সুযোগ থাকায় বলবান এবং কলহপ্রবণ লোকেরা ঘোড়ার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল।

হিমবন্যার প্রসঙ্গে উত্তর সমতল অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিরাট সমভূমি পশ্চিমে বল্‌টিক সাগর হইতে পূর্বে পীত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে মেরু প্রদেশ। দক্ষিণে পিরেনিজ পর্বত, আল্পস্ পর্বতমালা, দিনারী আল্পস্ এবং তার পরেই ককেসাস পর্বত, এশিয়া মাইনরের গিরিশ্রেণী, হিন্দুকুশ ও পামির, এবং শেষ প্রান্তে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ গিরিমালা হিমালয়। এই চতুঃসীমার ভিতরে আবদ্ধ সুবিশাল ভূখণ্ডকেই উত্তর সমতল অঞ্চল বলা হয়। ইহা ইউরোপ এবং এশিয়া—এই দুই মহাদেশেরই বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া অবস্থিত। পৃথিবীর শিশু সভ্যতা এই উত্তর সমতল অঞ্চলেই ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

পশুপালনে অভ্যস্ত হইবার পরে নব-প্রস্তর যুগের মানুষ দেখিল যে মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন না করিলে পশুদের খাদ্য যোগানো কঠিন হইয়া পড়ে। তাই তাহারা যাযাবর বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইল। মাঝে মাঝে তৃণ-ভূমির অধিকার লইয়া বিভিন্ন যাযাবর

সম্প্রদায়ের ভিতর যুদ্ধও হইতে লাগিল। এই সকল যুদ্ধে যাহারা ঘোড়ায় চড়িতে জানিত, তাহাদেরই কৃতিত্ব প্রকাশ পাইত সর্বাপেক্ষা বেশী। উত্তর সমতল অঞ্চলের পূর্বাংশের যাযাবরগণ ঘোড়ার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ ঐ ভূখণ্ডে মাঝে মাঝে যে সকল বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল আছে, তাহা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

এদিকে পশ্চিমাংশের যাযাবরেরা ঘোড়ার উপকারিতা বুঝিলেও তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল না। সাধারণতঃ ইহারা পায়ে হাঁটিয়াই পশু চরাইত এবং পদাতিক রূপেই যুদ্ধে লিপ্ত হইত।

সর্বদা ঘোড়ার পিঠে বসিয়া থাকার দরুণ পূর্বাঞ্চলের লোকেদের দেহের নিম্ন দিক ততটা পুষ্টিলাভ করিত না এবং তাহাদের দেহের উচ্চতাও সেই কারণে কম হইত। অপর পক্ষে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর জন্য পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের দেহ দীর্ঘ ও সুন্দর হইয়াছিল। সাধারণভাবে এই পশ্চিমীগণের বংশধরেরা পরবর্তী কালে নর্ডিক গোষ্ঠী নামে খ্যাত হয় এবং উরাল পর্বতের পূর্বদিকের যাযাবরগণ ক্রমশঃ মঙ্গোলীয় নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে।

নর্ডিক গোষ্ঠী

পূর্বে বলা হইয়াছে পশুচারণ-ভূমির সন্ধানে যাযাবর জাতিদের প্রায়ই নূতন নূতন দেশে অভিযান করিতে হইত।

নর্ডিক বংশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় এই উপলক্ষে পরস্পরের সম্মুখীন হইলে কলহ বিবাদের সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য ছিল। এইভাবেই সেই

আদিম যুগে উত্তর সমতল অঞ্চলের পশ্চিমাংশ অবিরাম অশান্তিপূর্ণ থাকিত। একদল অগ্রসর হইতেছে, আর একদল পিছাইয়া যাইতেছে, কেহ জয়লাভে উল্লসিত, কেহ বা প্রাণভয়ে পলায়নে তৎপর—সর্বদা একটা অস্থিরতা ও উন্মাদনা! লক্ষ লক্ষ মানুষে মিলিয়া যেন বিশাল অঞ্চলটাকে মন্থন করিয়া ফিরিতেছিল।

নর্ডিক গোষ্ঠীর সমস্ত জাতিই মূলতঃ একভাষাভাষী ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই আদিম ভাষাকে বলা হয় আর্যভাষা। একটি জিনিস মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইল এই যে—ঠিকভাবে দেখিতে গেলে 'আর্যজাতি' নামে কোন জাতি কোনদিনই পৃথিবীতে ছিল না, ছিল 'আর্যভাষা'। এই ভাষা হইতেই ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা এবং ইউরোপে ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আর্যভাষাভাষীদের একশাখা ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং মধ্য-এশিয়ার পথে ইরাণ ও ভারতে উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণেই আর্যভাষামূলক সমুদয় পরবর্তী ভাষায় একার্থবোধক এরূপ বহু শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের ভিতরে উচ্চারণগত সাদৃশ্যও অনেকটা রহিয়াছে।

যে জার্মানী দেশের কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তাহা এই নর্ডিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক কোন্ যুগে কোন্ সালে কোন্ জাতি কোথায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার সুনিশ্চিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নহে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই রোম সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু জার্মান দেশের মূল অংশ

কোনদিন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। জুলিয়াস সীজারের সময়ে গল বা ফরাসী দেশ রোমক শাসনের অধীনে আসে। সেখান হইতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া কালক্রমে ইংলণ্ডেও রোমের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ফরাসী দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী রাইন নদী পার হইয়া জার্মান দেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টাও যে দিগ্বিজয়ী রোমকেরা করে নাই তাহা নয়। কিন্তু ও-দেশ জয় করা অপরাজেয় রোমের পক্ষেও সহজ ছিল না।

পশ্চিমে রাইন নদী, উত্তরে উত্তর-সাগর, দক্ষিণে আল্পস্ পর্বত—জার্মান দেশের এই তিন সীমা চিরদিনই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু পূর্বসীমা সেরূপ নহে। এই দিকে জার্মানীর প্রতিবেশীদের মধ্যে পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর নাম করা যাইতে পারে। পোলাণ্ডের রাজনৈতিক আয়তন এত ঘন ঘন ও এত ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে যে তাহারই ফলে পূর্ব-জার্মানীর প্রধান রাষ্ট্র প্রাশিয়ারও সীমান্ত বারবার সংকুচিত বা সম্প্রসারিত না হইয়া পারে নাই। আর হাঙ্গেরীর অবস্থাও কোনদিনই কম অনিশ্চিত ছিল না। উহা কখনও হইত অস্ট্রিয়ার অধীন, কখনও সম-সম্মানের অধিকারীরূপে অস্ট্রিয়ার সহিত সংযুক্ত, কখনো আবার অস্ট্রিয়ার সহিত সম্বন্ধমুক্ত একেবারে স্বাধীন!

আর অস্ট্রিয়া! জার্মানীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত এই দেশ প্রকৃতপক্ষে জার্মান ভূখণ্ডেরই অংশ হইলেও রাজনৈতিক কারণে অনেক সময়েই ইহাকে পৃথক্ দেশ বলিয়া গণ্য করা হইত—এবং এখনও করা হয়।

তাহা ছাড়া পূর্ব সীমান্ত লইয়া জার্মান জাতির চিরন্তন উদ্বেগের আরও কারণ ছিল। নর্ডিক জাতিসমূহ যেভাবে পূর্ব দিক হইতে জার্মান দেশে প্রবেশ করে, ঠিক সেই ভাবেই পরবর্তী যুগে আল্পাইন গোষ্ঠীজাত স্লাভগণ এবং উত্তর সমতল অঞ্চলের পূর্বাংশবাসী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর হুনগণ বারবার পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই দেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে যুদ্ধবিগ্রহের আর অন্ত ছিল না।

দক্ষিণ দিকের প্রাকৃতিক সীমা যে আল্পস্ পর্বতমালা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু জুলিয়াস সীজারের পরবর্তী কালে রোমকেরা এই সীমানা লঙ্ঘন করিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিয়াছিল। আল্পস্ পর্বতের অনেকটা উত্তরে, পূর্ব-বাহিনী দানিয়ুব নদীকে রোমক সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তরূপে নির্দিষ্ট করা সম্রাট অগাস্টাসের একান্ত ইচ্ছা ছিল। হাঙ্গেরীর পূর্ব দিকে দানিয়ুবের উভয় তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রোমান প্রভুত্ব স্থাপনে তিনি সমর্থও হইয়াছিলেন। সেই হইতে উক্ত অঞ্চলের নামকরণ হইয়াছিল রুমানিয়া। কিন্তু জার্মানীর ঠিক দক্ষিণে দানিয়ুব পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া অগাস্টাসের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।



মাৎস্যন্যায়

"ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তরে, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।"

—রবীন্দ্রনাথ

যে-বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে এখন আমরা জার্মান দেশ বলিয়া জানি, তাহা ইতিহাস-পূর্ব যুগে নর্ডিক জাতির বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল—এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিভিন্ন যাযাবর সম্প্রদায় বিভিন্ন যুগে এই ভূখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের এক একটি এখনও ক রঙ্গের মত

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যাযাবরেরা ক্রমে এক স্থানে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে শিখিয়াছে, কারণ ঘুরিয়া বেড়াইবার মত স্থান আর জুটে নাই ; সকল স্থানই নূতন নূতন মানুষের আগমনে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাধ্য হইয়া যে যেখানে পারিয়াছে তাঁবু গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে। তাঁবু ক্রমে পরিণত হইয়াছে গ্রামে ও নগরে। পশুপালকেরা অবলম্বন করিয়াছে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বৃত্তি।

কিন্তু এই একস্থানে বাস করার ব্যাপারটা একদিনে সম্পন্ন হয় নাই। যাযাবর হইতে গ্রামিকের পর্যায়ে উপনীত হইতে অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘ শতাব্দীগুলি ধরিয়া প্রতি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি লোক যুদ্ধকে তাহার জীবন-যাত্রায় একটি বড় স্থান দিয়া আসিয়াছে।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অগ্রগতির পর পশ্চাদপসরণ—দীর্ঘ যুগ এইভাবে চলিবার পর সমগ্র দেশটা নানা সম্প্রদায়ের ভিতর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ছিল স্ব-স্ব প্রধান। কেহ কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিত না। যুদ্ধ হইত এবং তাহার পরে সন্ধি হইতেও বিলম্ব হইত না। কিন্তু সে-সব সন্ধির স্থায়িত্ব ছিল দুই চারি বৎসর মাত্র।

রোম কর্তৃক জার্মান ভূখণ্ডের উপর প্রথম আক্রমণ ঘটিয়াছিল সম্রাট অগাস্টাসের সময়, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। ভেরাস নামক জনৈক রোমক সেনাপতি বিশ হাজার সৈনিক সহ রাইন নদী পার হইলেন। জার্মান দেশে কোন রাস্তা ছিল না, সমগ্র দেশটা জঙ্গল ও জলায় পূর্ণ। রোমকেরাই প্রথম সৈন্য চলাচলের উপযুক্ত রাজপথ

নির্মাণ করিল। ভেরাস সমগ্র দেশটাকে ইচ্ছামত ভাগ করিয়া প্রতি ভাগের জন্য রোমান আদর্শ-অনুযায়ী শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু জার্মান জনগণ রোমক নীতি বা রোমক শাসন-পদ্ধতি একটুও পছন্দ করিল না। তাহারা এই অবাঞ্ছিত শাসকদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য একতাবদ্ধ হইল।

জনৈক বীর যোদ্ধা এই স্বাধীনতার যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ভেরাসের সমস্ত সৈন্যকে এক বনের মধ্যে ঘিরিয়া তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধে তাহাদিগকে ক্রমশঃ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ভেরাস আত্মহত্যা করিয়া পরাজয়ের কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইলেন।

কিছুসংখ্যক রোমক সৈন্য কোনমতে পলাইয়া রাইনের ওপারে উপস্থিত হইল। সেখানে গলের শাসনকর্তৃপক্ষের কাছে তাহারা এই মর্মে দুঃসংবাদ জানাইল যে জার্মানীর "কোন একটি জায়গায়" একটা সাংঘাতিক বিপদ ঘটিয়া গিয়াছে।

জার্মানী বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা অতঃপর রোম-সম্রাটেরা চিরতরে ত্যাগ করিলেন। এখন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল যাহাতে রাইন পার হইয়া জার্মানেরা গল আক্রমণ করিতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে রাইনের তীরে কতিপয় সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত হইল।

আল্পস্ পর্বতের উত্তর গায়ে এক বিরাট বন আছে, তাহার নাম 'কৃষ্ণ মহারণ্য' (ব্ল্যাক্ ফরেস্ট)। এই অঞ্চল হইতেই দানিয়ুব নদী বাহির হইয়া জার্মানীর দক্ষিণ সীমান্ত ধরিয়া পূর্বদিকে বহিয়া গিয়াছে। অপরপক্ষে কৃষ্ণ মহারণ্যের সামান্য পশ্চিমে আল্পস্ পর্বত হইতে রাইন নদীও উৎপন্ন হইয়াছে। রাইন ও দানিয়ুবের মধ্যবর্তী

এই অরণ্যটি রোমকেরা অধিকার করিয়া লইল এবং এখানে বহু দুর্গ তৈয়ারি করিয়া জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিল।

গথ জাতি

কিন্তু রাইন ও দানিয়ুব তীর সুরক্ষিত করিয়াই ত' রোমক সম্রাটগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না! জার্মানগণ দানিয়ুবের উত্তরবর্তী রুমানিয়ায় বারংবার হানা দিতে লাগিল। এই জার্মানেরা 'গথ' নামে ইতিহাসে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ইহারা বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং মাঝে মাঝে বলকান উপদ্বীপের ভিতরেও ঢুকিতে থাকে। প্রতিবারই রোমক সৈন্যের হাতে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেও, তাহাদের দিগ্বিজয়ের স্পৃহা একটুও ক্ষুণ্ণ হইল না। তাহাদের স্থলসৈন্যদল ক্রমাগত গ্রীসের উত্তর প্রান্তে টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল, এবং তাহাদের নৌবাহিনী কৃষ্ণসাগরের উপকূল অতিক্রম করিয়া দার্দানেলিজ প্রণালীর ওপারে ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত ধাবিত হইল।

ওদিকে জার্মানীর পশ্চিমাংশে দানিয়ুবের ঊর্ধ্বাংশ অতিক্রম করিয়া অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত জার্মানেরা রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হানা দিতে আরম্ভ করিল। ফ্রাঙ্ক ও আলেমানগণ গল দেশ আক্রমণ করিল। ফ্রাঙ্কেরা সেখান হইতে স্পেনে, এবং স্পেন হইতে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হইয়া আফ্রিকায় প্রবেশ করিল। আবার উত্তর জার্মানীর স্যাক্সন সম্প্রদায়গুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া ব্রিটেন

আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইংলিশ প্রণালীস্থিত রোমক নৌবাহিনীর সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎই রোমক সম্রাটের হস্তে গথগণের দারুণ পরাজয় ঘটিল, গ্রীস হইতে তাহারা একেবারেই বিতাড়িত হইল।

পরবর্তী সম্রাট অরেলিয়ান বুঝিতে পারিলেন যে দানিয়ুবের উত্তরবর্তী রুমানিয়া অধিকারে রাখিতে হইলে গথগণের সহিত কলহ কোনদিনই মিটিবে না। তাই তিনি রুমানিয়া ত্যাগ করিয়া দানিয়ুবকেই নিজ সাম্রাজ্যের উত্তর সীমারূপে স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু দানিয়ুবের দক্ষিণে কোন জার্মানকে দেখিতে পাইলে অরেলিয়ানের কর্মচারিগণের হস্তে তাহার নিস্তার ছিল না। সম্রাটের কঠোর আদেশে তখনই তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

কনস্টান্‌টাইন

অরেলিয়ানের পরে ডাওক্লিশিয়ান রোমের সম্রাট হইলেন। তিনিও জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন।

কনস্টান্‌টাইন ছিলেন ডাওক্লিশিয়ানের জনৈক কর্মচারীর পুত্র। সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সেই সময়ে আশ্চর্য রাজনীতিজ্ঞান ও শৌর্যের পরিচয় দিয়া কনস্টান্‌টাইন সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। জার্মানদিগকে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত করিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে জার্মান রক্তবীজকে সমূলে ধ্বংস করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তাঁহার আশঙ্কা হইল যে রোম সাম্রাজ্য হয়ত চিরদিন ইহাদিগকে দানিয়ুবের

ওপারে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। তাহা হইলে রোমের পতন হইবে।

এই সম্ভাব্য বিপদের প্রতিকার কিসে হইতে পারে, সম্রাট সেই চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি এক দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হওয়ার সংকল্প করিলেন। রোম মহানগরী দীর্ঘকাল ধরিয়া বিরাট মহাসাম্রাজ্যের রাজধানী রহিয়াছে। তিনি সেই বহু-বৎসরের পুরাতন রাজধানী ত্যাগ করিয়া বাইজান্‌টিয়াম নগরে সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই নগরের নূতন নাম হইল কনস্টান্‌টিনোপল।

সম্রাট কনস্টান্‌টাইন আরও একটা যুগান্তকারী কাজ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্মকে এতদিন সকল স্থানেই ঘোরতর পীড়ন সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছিল। তিনি এই পীড়ন বন্ধ করেন। নিজে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইহার অবাধ প্রচারের পথ মুক্ত করিয়া দেন।

ইহার প্রতিক্রিয়া জার্মানীতেও দেখা দিল। বহু দেবদেবীপূজক জার্মানগণ ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা লইতে লাগিল।

উল্‌ফিলা

৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে উল্‌ফিলা নামক জনৈক পণ্ডিত গথ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন। কিন্তু এইখানে সূচনাতেই একটা বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। খ্রীষ্টধর্মের ভিতরও দুইটি সম্প্রদায় ছিল, একটি হইল রোমক সম্প্রদায় আরটি হইল আর্য সম্প্রদায়। কনস্টান্-

টাইন কর্তৃক আহূত এক ধর্মসভা এই আর্যগ্রীষ্টধর্মকে নিষিদ্ধ বলিয়া ইতিপূর্বে ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু উল্‌ফিলা এই নিষিদ্ধ আর্যগ্রীষ্ট-ধর্মকেই জার্মানীতে প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে রোমের সঙ্গে জার্মানীর কলহের নূতন একটি কারণ সৃষ্টি হইল। পূর্বে যুদ্ধ ঘটিত কেবল রাজ্যলিপ্সার দরুণ, এখন তাহার সহিত দ্বিতীয় একটি কারণ যুক্ত হইল—ধর্মবিরোধ।

কনস্টান্‌টাইনের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র নিজেদের ভিতর সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন (৩৩৭ খ্রীঃ)। ইহার পর তিন সম্রাটে ক্রমাগত আত্মকলহ চলিতে থাকিল। ঘন ঘন সম্রাট পরিবর্তনের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলিয়া উঠিল। অবশেষে ৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে দুই জন সম্রাটের ভিতর সমস্ত সাম্রাজ্য বিভক্ত হইল। একজন অধিষ্ঠান করিলেন রোমে, অপর জন কনস্টানটিনোপলে।

হুন

এই সময়ে এক সাংঘাতিক বিপদ উপস্থিত হইল। মধ্যএশিয়া-বাসী হুন নামক মঙ্গোলীয় জাতি ঝটিকাবেগে আসিয়া পূর্ব ইউরোপ ছাইয়া ফেলিল। তাহারা যেরূপ সাহসী তেমনি নির্মম ছিল। কোন শত্রুর সঙ্গে তাহারা সন্ধি করিত না। শত্রু পাইলেই মারিয়া ফেলিতে হইবে—এই ছিল তাহাদের রীতি।

তাহাদের আক্রমণে দুর্ধর্ষ গথেরাও ভীত হইয়া পড়িল। প্রথম দিকে কিছুদিন তাহারা এই শত্রুকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অমিত শক্তির পরিচয় পাইবার পরে আর

তাহাদের যুদ্ধ করিবার সাহস রহিল না। দানিয়ুবতীরে মিলিত হইয়া তাহারা রোমসম্রাটের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইল। নদীর এ-পারে আসিতে না পারিলে হুনদের হাতে তাহাদের রক্ষা নাই।

কনস্টান্টিনোপল নগরে অধিষ্ঠান করিয়া যে-সম্রাট তখন পূর্ব-সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতেছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ভ্যালেন্স্। তিনি আশা করিতে লাগিলেন যে গথ জাতিকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আশ্রয় দিলে তাহারা ক্রমে শান্তিপ্রিয় রোমক নাগরিকে পরিণত হইবে এবং হুন আক্রমণের বিরুদ্ধে বুকের রক্ত দিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে। এই আশায় তিনি আশ্রয়প্রার্থী গথ সম্প্রদায়গুলিকে দানিয়ুব পার হইবার অনুমতি দিলেন। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া হাজারে হাজারে নৌকা গথগণকে নিশিদিন নদীর ওপার হইতে এপারে বহন করিয়া আনিতে লাগিল। গথজাতির একটা বৃহৎ অংশ রোম সাম্রাজ্যের নাগরিকে পরিণত হইল।

কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন সহজে হয় না। গথেরা বেশীদিন শান্তি-রক্ষা করিয়া চলিতে পারিল না। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমকেরা তাহাদের আক্রমণে ভীষণভাবে পরাজিত হইল। সম্রাট ভ্যালেন্স্ নিজে যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদলের দুই-তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হইল। দিকে দিকে জার্মান অশ্বারোহীরা বিজয়গর্বে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাম্রাজ্যের কর্তারা বিপদ গণিলেন। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের বাহিরে কোন স্থানই বুঝি আর গথগণের আক্রমণ হইতে নিরাপদ নয়।

পরবর্তী সম্রাট থিওডোসিয়াস জাতিতে ছিলেন স্পেনিয়ার্ড। তিনি নিজে ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি। তিনি গথগণকে বারবার পরাজিত করিলেন। অবশেষে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া সম্রাটের রোষ হইতে আত্মরক্ষা করিল। ইহার পর কিছুদিন পর্যন্ত পূর্ব সাম্রাজ্যে আর তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করে নাই।

থিওডোসিয়াস পূর্ব সাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপন ও শাসনসংস্কার করিয়া অচিরেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ওদিকে পশ্চিম সাম্রাজ্যের সম্রাট গুপ্তঘাতকের করে নিহত হইলেন। হত্যা-কারীকে ধৃত ও দণ্ডিত করিবার জন্য থিওডোসিয়াসকে রোমে আসিতে হইল। এখানে আসিয়া তিনিও অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (৩৯৫ খ্রীঃ)। তাঁহার দুই পুত্র ছিল, দুই জনই শিশু। সেই শিশুদেরই একজনকে রোমের, অপরজনকে কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে অভিষেক করা হইল। নাবালক রোম সম্রাটের অভিভাবক হইলেন স্টিলিকো, ইনি জাতিতে ভ্যাণ্ডাল।

ভ্যাণ্ডালগণ জার্মানীরই অন্যতম পরাক্রান্ত উপজাতি। হুন-আক্রমণে ভীত হইয়া গথেরা যেমন রুমানিয়ার পথে রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকিয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই পলায়িত ভ্যাণ্ডালেরাও সুইজার্লাণ্ডের ভিতর দিয়া আসিয়া ইতালীতে আশ্রয় লইয়াছিল। ক্রমে ইতালীয় ভূখণ্ডে তাহারা এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল যে সাম্রাজ্য পরিচালনাতেও তাহারা নিজেদের প্রভাব প্রয়োগ করিতে লাগিল। এইরূপেই নাবালক সম্রাটের অভিভাবক পদে জার্মান ভ্যাণ্ডাল স্টিলিকোর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল।

আলারিক

থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর গথেরা আবার মাথা তুলিল। পূর্ব রোমক-সাম্রাজ্যের সকল অংশেই তাহারা অশান্তির সৃষ্টি করিতে লাগিল। দানিয়ুবের ওপার হইতে গথ-নেতা আলারিক কনস্টান্টিনোপলের দ্বারে আসিয়া হানা দিলেন। সম্রাটের এমন শক্তি ছিল না যে এই স্পর্দ্ধিত শত্রুকে বাধা দিবেন। পক্ষান্তরে আলারিকেরও এমন ইচ্ছা ছিল না যে পূর্ব সাম্রাজ্যটা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া বিধ্বস্ত করিবেন। কাজেই উভয়পক্ষে একটা সন্ধি হইয়া গেল। প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া আলারিক দানিয়ুবের ওপারে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া আলারিক গ্রীস দেশ লুণ্ঠন করিয়া বিচরণ করিতে থাকিলেন। ইতালীর উপরও মাঝে মাঝে হানা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহাকে স্টিলিকোর প্রতিরোধের সম্মুখে হঠিয়া আসিতে হয়। স্টিলিকো নিজে জার্মান হইলেও জার্মান আলারিকের হাত হইতে রোম সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু এ-সৌভাগ্য সাম্রাজ্যের ভাগ্যে বেশীদিন টিকিল না। থিওডোসিয়াসের নাবালক পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে তিনি কেবল নামেই রোমসম্রাট, সাম্রাজ্য শাসনের সমুদয় ক্ষমতাই রহিয়াছে স্টিলিকোর হাতে। তিনি ক্রমশঃ ঈর্ষায় অন্ধ হইয়া উঠিলেন। কুযুক্তি দিবার লোকও অনেক ছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বালক সম্রাট একদিন স্টিলিকোর পিছনে গুপ্তঘাতক লাগাইয়া দিলেন। স্টিলিকোর রক্তে সম্রাট-প্রাসাদের দরবার-কক্ষ লাল হইয়া উঠিল।

স্টিলিকোর মৃত্যুতে লাভবান্ হইলেন আলারিক। যে নির্ভীক্ যোদ্ধা এতদিন ইতালীর উপকূল হইতে অপরাজেয় গথগণকে বারবার বিতাড়িত করিয়াছেন, তিনি আর নাই! শীঘ্রই নূতন উৎসাহে আলারিকের বিজয়-বাহিনী ইতালী আক্রমণ করিল। এবার আর বাধা দিবার কেহ নাই। রোমে বসিয়া তরুণ সম্রাট অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। আলারিক আসিয়া পড়িলেন।

সামান্য যুদ্ধের পর (৪১০ খ্রীষ্টাব্দে) রোম গথগণের পদানত হইল। যে মহানগরীতে হাজার বৎসরের ভিতর শত্রুবেশে কেহ ঢুকিতে পারে নাই, তাহা এক পক্ষকাল ধরিয়া নির্মমভাবে লুণ্ঠিত হইল। সমগ্র পৃথিবী এ-সংবাদ শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল!

রোমনগরের সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করিয়া লইয়া আলারিক ফিরিয়া গেলেন। ক্রমশঃ রোম অবশ্য আবার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু পশ্চিমদিকের সাম্রাজ্য আর তাহার পূর্বেকার গৌরব ফিরিয়া পাইল না। রোম অপরাজেয় বলিয়া পৃথিবীর লোকের যে ধারণা ছিল, তাহা চিরতরে বিনষ্ট হইল।

ইহার অল্পদিন পরেই আলারিকের মৃত্যু হয় এবং নেতৃবিহীন গথ-সৈন্যবাহিনী ইতালী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পূর্ব হইতে যে-সমস্ত গথ ইতালীতে বসবাস করিতেছিল, তাহারা এখন পূর্ব সাম্রাজ্যের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া আগন্তুক জার্মান ও হুন আক্রমণকারীদের হাত হইতে সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষটুকুকে রক্ষা করার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিল।

ওদিকে জার্মান দেশ হইতে বহু উপজাতি গলদেশে ঢুকিয়া খুশী-মত উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিল—কারণ রাইনতীরবর্তী দুর্গগুলিতে তখন আর রোমক সৈন্য ছিল না।

এই সকল টিউটন জার্মান উপজাতির ভিতর গথ ও ভ্যাণ্ডাল-গণই ছিল প্রধান। গল দেশে গথগণ এক বৃহৎ প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিল এবং ভ্যাণ্ডালগণ গলের ভিতর দিয়া প্রথমে স্পেনে, তারপর স্পেন হইতে আফ্রিকায় প্রবেশ করিল। তাহাদের রাজা ছিলেন জেইসেরিক। তিনি ক্রমে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠেন।

উত্তর আফ্রিকায় নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি প্রাচীন কার্থেজ নগরীতে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি মাঝে মাঝে ইতালীতেও হানা দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শক্তিশালী নৌবহরের সহায়তায় ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশের দ্বীপগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। পশ্চিম সাম্রাজ্যের তখন এরূপ দুরবস্থা যে সম্রাটকে আবার সিসিলী দ্বীপটি জেইসেরিকের নিকট হইতে অর্থ দিয়া কিনিয়া লইতে হইল।

আটিলা

এই সময়ে গথ, ভ্যাণ্ডাল, রোমক,—সকলকে পায়ে দলিয়া দুর্ধর্ষ আটিলা ঝড়ের বেগে উত্তর ইউরোপের উপর দিয়া অগ্রসর হইলেন। অস্ট্রিয়ার পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ প্রদেশে কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছিলেন। সেই কারণেই ঐ প্রদেশের হাঙ্গেরী (হুন-দেশ) নামকরণ হইয়াছিল। সেই কেন্দ্রীয় শিবির

হইতে যখন যে-দেশের কাছে আটিলা যত অর্থ চাহিয়া পাঠাইতেন, তখনই সেই দেশকে যে ভাবে হউক সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার চরণে উপঢৌকন পাঠাইতে হইত। পূর্ব-সাম্রাজ্য, পশ্চিম-সাম্রাজ্য, গথ, ভ্যাণ্ডাল কাহারও উপর তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না, সকলকে সমানভাবে অধীনে রাখিয়া শোষণ করাই ছিল তাঁহার নীতি।

কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল যখন অর্থ দিবার সঙ্গতি আর কাহারও রহিল না। তখন ক্রুদ্ধ আটিলা পাঁচলক্ষ হুন লইয়া হাঙ্গেরী হইতে বাহির হইলেন। সকলের আগে পশ্চিম-সাম্রাজ্যটা ধ্বংস করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি জার্মান দেশ ও গলের ভিতর দিয়া ইতালীর দিকে অভিযান করিতে মনস্থ করিলেন। সমগ্র জার্মান দেশ তাঁহার পদানত হইল। গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, আলেমান প্রভৃতি উপজাতির অধিকাংশ লোকই দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। যাহারা করিল না, তাহারা আটিলার সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য হইল।

যাহা হউক, আটিলার গৌরবের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল! এই স্বেচ্ছাচারী বীরকে বাধা দিবার জন্য সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ ঐক্য-বদ্ধ হইল। গলবাসী গথ ও রোমানগণ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আটিলার সম্মুখে দাঁড়াইল। শ্যালোঁ নগরে হইল ভয়াবহ এক সংগ্রাম—যে-শ্যালোঁতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনীর হস্তে কাইজার উইলিয়ামের বিজয় বাহিনীর প্রথম পরাজয় ঘটিয়াছিল।

শ্যালোঁর এই প্রথম যুদ্ধে আক্রমণকারী হুনগণ পরাস্ত হইল। আটিলা হতাশ হইয়া হাঙ্গেরীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পর বৎসর তিনি আবার সৈন্য সাজাইয়া ইতালীতে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন সেখানে অবস্থান করিলেন না। এ কথা ঠিক যে তাঁহাকে তাড়াইবার মত শক্তি ইতালীতে কাহারোই ছিল না; তবুও তিনি নিজে হইতেই ইতালী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সম্ভবতঃ তাঁহার সৈন্যেরা এভাবে চিরদিন দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে অস্বীকার করিয়াছিল। হাঙ্গেরীতে স্থায়ী-ভাবে বাস করিতে পারায় হয়ত তাহারা যাযাবর বৃত্তির উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া আটিলার ফিরিয়া যাওয়ার আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দুই বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও জার্মানেরা হুনগণকে জার্মান দেশ হইতে বিতাড়িত করে।

আটিলার পতনের পর সমগ্র ইউরোপে জার্মানরাই সবচেয়ে শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল। গলদেশ তখন দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশের অধীশ্বর পশ্চিমী গথগণ, অন্য অংশের ফ্রাঙ্ক উপজাতি। পশ্চিমী গথেরা স্পেন দেশে ঢুকিয়া ভ্যাণ্ডালদের দ্বারা অত্যাচারিত জনপদে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ওদিকে আফ্রিকাতে ভ্যাণ্ডালগণই সর্বময় প্রভু। জেইসেরিক সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি, তাঁহার প্রতাপে ইতালী অবধি কম্পিত; আলারিকের অনুকরণে তিনিও একদিন রোম আক্রমণ করিয়া পনের দিন ধরিয়া সেই মহানগরী লুণ্ঠন করিলেন। জেইসেরিকের মৃত্যু হয় ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

জার্মান সাম্রাজ্য

বস্তুতঃ ইতালীতে পশ্চিম সাম্রাজ্যের যে নামমাত্র-সম্বল সম্রাটগণ তখনও সিংহাসনে বসিতেছিলেন, তাঁহাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। দুই এক বৎসরের বেশী তাঁহারা কেহই সম্রাট থাকিতে পারিতেন না, হয় গুপ্তঘাতকের হাতে মারা পড়িতেন, নয় ত' সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই জার্মান দেশাগত কোন-না-কোন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের হাতে খেলার পুতুল মাত্র ছিলেন। অবশেষে এইরূপ এক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক, শেষ সম্রাট অগষ্টাস রোমুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হইয়া বসিলেন। ইঁহার নাম ওদোভাকার।

এইরূপে ইউরোপখণ্ডে রোম সাম্রাজ্যের পতন হইল। কিন্তু সেই সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ইউরোপবাসীকে বহু শতাব্দী পর্যন্ত অভিভূত করিয়া রাখিল। পরবর্তী কালে "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য" নামে ইউরোপে যে-সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা নামে "রোমক" হইলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল জার্মান সাম্রাজ্য। এই নূতন সাম্রাজ্যের প্রেরণা আসিয়াছিল রোম হইতে।



জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

—রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের অবসানের পরে ইউরোপের সর্বত্র টিউটন বা জার্মান-জাতীয় শাসকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বর্বর টিউটন উপজাতিগণ নানা-স্থানে রাজ্য গড়িয়া তুলে। ক্রমাগত তাহাদের ইচ্ছামত বিভিন্ন

রাজ্যে ভাঙ্গা-গড়ার ফলেই বহুদিন পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব চলে। অবশেষে অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট শার্লামেন এসে পশ্চিম ইউরোপে শান্তি ও নূতন ধারার প্রবর্তন করেন।



বর্বর উপজাতিগণের আক্রমণ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের অন্ধকার যুগে যে জার্মান উপজাতীয় রাজ্যগুলি বেশী প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল তাদের নাম অস্ট্রোগথ, ভিসিগথ, বার্গাণ্ডিয়ান, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্কস্, লম্বার্ডস এবং এ্যাংলো-স্যাকসনদের রাজা। এই জার্মান বা টিউটন উপজাতিসমূহ

অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী ছিল এবং রোমক সভ্যতা বিনষ্ট করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারাই বর্তমান ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালীর জাতিবৃন্দের গঠনের অগ্রদূত। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের লেখা হইতে পাওয়া যায় যে জার্মানরা সে-যুগেও বর্বর ও অশিক্ষিত হইলেও স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বায়ত্তশাসন-বোধসম্পন্ন ছিল। তাহারা ইউরোপের জাতিগুলির গঠনে অনেক কিছু দান করিয়াছে।

ক্রমে গল-দেশে ফ্রাঙ্কগণের নিকট গথেরা পরাজিত হইল, এবং ফ্রাঙ্ক-নৃপতি ক্লোভিস নিজের জাতির নামে গলদেশের নূতন নাম-করণ করিলেন "ফ্রান্স"। ভ্যাণ্ডালগণ আফ্রিকার বার্বার ও মুর জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইতালীর ওদোভাকারও ডায়েট্রিক নামক অন্য এক জার্মান ভাগ্যান্বেষীর দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইলেন। এই ডায়েট্রিকের রাজত্বও বেশীদিন টিকিল না।

খাস জার্মানীতে সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন স্যাক্সনির অধীশ্বরেরা। জার্মান ভূখণ্ড বহু প্রদেশ ও রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এইসব প্রদেশ শাসন করিতেন ডিউক, গ্রাণ্ডডিউক, কাউণ্ট, বিশপ, আর্কবিশপ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিধারী শাসকেরা। তাঁহারা সবাই স্বাধীন ও স্বপ্রধান ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়াই ছিল।

তাহার উপর অশান্তির আরও কারণ ছিল। রাজ্যশাসকগণ ছাড়াও বহু স্বাধীন দুর্গস্বামী পাহাড়ে ও জঙ্গলে কেল্লা গড়িয়া দেশের উপর অত্যাচার করিত। তাহারা কৃষকদের শস্য লুণ্ঠন করিত এবং

বণিকদের পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইত। ইহার ফলে নিরীহ প্রজাগণ সদাসর্বদা ভীত হইয়া থাকিত।

দেশের ভিতর সামরিক শ্রেণীর প্রতিপত্তি স্বভাবতঃই বেশী ছিল। তাহার পরই ছিলেন যাজক সম্প্রদায়। জার্মান খ্রীষ্টানেরা আর্যমতের অনুগামী ছিলেন, ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। আর্যমত রোমের গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম হইতে কোন-কোন বিষয়ে একটু অন্যরকম ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে রোমীয় খ্রীষ্টানেরা যীশুখ্রীষ্টের দেবত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আর্যখ্রীষ্টানেরা কিন্তু বলিতেন—তিনি মানব ছাড়া কিছুই নহেন।

এইভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান কেন্দ্র রোম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খাস জার্মানীর জার্মানেরা রোমক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দানগুলিও আত্মসাৎ করিবার সুযোগ পাইল না। কাব্য, দর্শন, শিল্পকার্য প্রভৃতির দিক দিয়া পাশ্চাত্ত্যজগতে গ্রীসই ছিল পথপ্রদর্শক, এবং ঐ সকল বিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ রোমই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই রোমের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন না করায় জার্মানজাতি বহু শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ রহিয়া গিয়াছিল—অবশ্য যুদ্ধবিদ্যায় নহে।

ভূমিদাস

যাজকগণের নীচেই কৃষকশ্রেণীর নাম করা যায়। ইউরোপের সর্বত্র এক নিন্দনীয় প্রথা বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত ছিল। যাহারা কৃষিকার্য করিত, তাহারা প্রায় সকলেই ছিল পুরুষানুক্রমে ভূমিদাস

বা "সার্ফ"। ইহারা বড় বড় ভূস্বামীদের ক্রীতদাসের মতই ছিল। জমির সহিত এই দাসগণকেও ক্রয় বা বিক্রয় করা চলিত। ইহারা সর্বতোভাবেই প্রভুসমাজের অধীন ছিল। অবশ্য ইহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করা ভিন্ন অন্য কোন উৎপীড়ন করিবার অধিকার আইনতঃ প্রভুদের ছিল না। জমি ছাড়িয়া গেলেও ইহারা এই খাজনার দায় হইতে উদ্ধার পাইত না। পৃথিবীর যে-অংশেই যাউক না কেন, প্রভুর খাজনার জন্য ইহারা আইনতঃ দায়ী থাকিত।

এই প্রথার উৎপত্তি হয় মিসরে; সেখান হইতে ইহা রোমে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তথা হইতে সমগ্র সভ্যজগতে। মোটের উপর ভূমিদাসেরা প্রায় সকল দেশেই ছিল অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং অজ্ঞান। পশুর মত তাহাদিগকে খাটিতে হইত, এবং পশুর মতই কষ্টের জীবন তাহারা যাপন করিত।

সাধারণ লোকদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। যাজকদের নিকট খ্রীষ্টধর্মের বিকৃত শিক্ষা যেটুকু পাইত, তাহাই ছিল তাহাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস। বলা বাহুল্য এই যাজকগণেরও অনেকে ছিল নামমাত্র শিক্ষিত। ইউরোপের ইতিহাসের মধ্য-যুগের প্রথম-ভাগকে যে অন্ধকার-যুগ বলা হয়, তাহা জ্ঞানালোকের অভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে কোনমতেই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তবে, এইসময়ে সমগ্র ইউরোপে সন্ন্যাসী-যাজকগণের আবির্ভাব বশতঃ শিক্ষা ও ধর্মের ভবিষ্যৎ কতকটা উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছিল। এই সন্ন্যাসী-যাজকেরা দুই শ্রেণীর ছিলেন। কেহ বা নির্জন স্থানে একাকী ভগবৎচিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন, কেহ আবার নিজ শ্রেণীর

অন্যান্য যাজকগণের সহিত মিশিয়া কোন নির্জন স্থানে মঠ স্থাপন করিতেন একত্রে ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে। উভয় শ্রেণীর যাজকেরাই চির-কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করিতেন।

স্ত্রীশিক্ষা

শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও মঠবাসিনী হইতে আরম্ভ করেন এই যুগেই। নারীদের মঠে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত। প্রকৃতপক্ষে মঠ ভিন্ন অন্য কোথাও নারীদের শিক্ষার কোন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা সে-যুগে ছিলই না।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আলারিক ও আটিলার মৃত্যু হয়। তাহার পর অনেকদিন পর্যন্ত জার্মান ভূখণ্ডে স্মরণীয় কোন যোদ্ধার আবির্ভাব হয় নাই। ইতিমধ্যে (৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) জার্মানীর লম্বার্ড উপজাতি ইতালী আক্রমণ করে, এবং রোমের বিশপের বা পোপের অনুরোধে ফ্রান্সের রাজা পিপিন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ইতালীতে যান। লম্বার্ডেরা পরাজিত হয় এবং তাহাদের অধিকৃত লম্বার্ডি-প্রদেশ রোমের পোপের অধিকারভুক্ত হয়।

পিপিন নিজের স্বার্থের খাতিরে রোমের পোপকে ইতালীর অন্যান্য শাসকদের মত রাজত্বের অধিকারী করিলেন; কিন্তু ইহার ফলে ভবিষ্যতে পোপের ক্ষমতাবৃদ্ধির সুবিধা হইল এবং দীর্ঘকালব্যাপী জার্মান সম্রাটদের সঙ্গে পোপদের তীব্র বিরোধের পথ আরও পরিষ্কার হইল। অবশ্য সবচেয়ে অনিষ্ট হইল ইতালীর। পোপগণ নিজেদের স্বাধীন

রাজত্ব বজায় রাখার জন্য বরাবরই ইতালীর ঐকাবদ্ধ রাজ্য গঠনে বাধা দিতে লাগিলেন।

শার্লামেন

পিপিনের পুত্র শার্লামেন জার্মানগণের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমগ্র ফ্রান্সদেশে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা



শার্লামেনের অভিষেক

করিয়া তিনি ইতালীতে গমন করেন, এবং রোমের পোপ কর্তৃক (৮০০ খ্রীষ্টাব্দে) ভগবান যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে রোম-সম্রাট পদে অভিষিক্ত

হন। জার্মানীর যে সমস্ত লম্বার্ড উপজাতি ইতালীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, শার্লামেন তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। তিনি জার্মানদেশের ভিতরে ঢুকিয়াও নিজের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। ব্যাভেরিয়া সম্পূর্ণরূপে শার্লামেনের পদানত হয়, এবং দুর্ধর্ষ স্যাক্সনগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জার্মান ভূখণ্ডে শার্লামেন সম্রাটরূপে স্বীকৃত হন। প্রাচীন রোম সম্রাটগণ জার্মানীতে কোন দিন নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। এদিক দিয়া শার্লামেন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন।

সম্রাট শার্লামেন ও তাঁহার প্রবর্তিত ক্যারলিংগিয়ান বংশের রাজগণকে ফরাসী না বলিয়া বরং জার্মান বলা চলে। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে রোমান ও টিউটন রীতিনীতি এবং ভাবধারার মধ্যে সংমিশ্রণ চলিতে থাকে।

উত্তরদেশীয় অভিযাত্রিগণ

শার্লামেনকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া ইউরোপবাসী আশা করিয়াছিল যে আবার রোম-সাম্রাজ্যের গৌরবের দিন ফিরিয়া আসিবে এবং এক রাজচ্ছত্রের অধীনে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ শান্তি-সুখ ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু সে-আশা অচিরেই চূর্ণ হইল।

দশম শতাব্দীতে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কবাসী পৌত্তলিক জাতিরা সমগ্র ইউরোপে অভিযান চালাইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং

ইতালীতে তাহারা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডগুলি অধিকার করিয়া বসিল। শার্লামেনের বংশধরগণ তাহাদের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। সাম্রাজ্যের ঐক্য আবার অতীতের স্বপ্নে পর্যবসিত হইল। এই নব অভিযানীদের নূতন নর্থম্যান (উত্তরদেশীয় লোক) বা সংক্ষেপে নর্ম্যান বলা হয়। ডেনগণ তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে জার্মানরাও তাহাদের সমজাতীয় ছিল।

রোমক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এই নর্ম্যানেরা ক্রমশঃ তাহাদের পৌত্তলিকতা বিসর্জন দিল এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিল। ইতালীর তখন বড় দুর্দিন। রোমের যাজকপ্রধান পোপ নামে সমগ্র ইউরোপীয় খ্রীষ্টানগণের ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন এবং রোমের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডের উপর নিজের একটি রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি নিজেকে সমগ্র ইতালীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতেন; কিন্তু শক্তিমান্ ডিউক ও কাউণ্টগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার মত সামরিক শক্তি তাঁহার ছিল না। এই অবস্থায় তিনি নর্ম্যানগণের - সহিত মৈত্রী স্থাপন করা সংগত মনে করিলেন।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন নর্ম্যান যোদ্ধা পোপ কর্তৃক আপুলিয়ার ডিউকপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণ-ইতালী ও সিসিলি দ্বীপকে একরাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া স্বয়ং তাহার রাজা হইয়া বসিলেন। এই সিসিলি রাজ্য অল্পকাল পরেই জার্মান দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক যোগসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা হইবে।

ম্যাগেয়ার জাতি

শার্লামেন জার্মান দেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া উক্ত দেশের পূর্ব-সীমান্ত রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকালে ঐ সীমান্তে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ সে-শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্বদিক হইতে স্লাভ ও মঙ্গোলীয় আক্রমণকারিগণ আগের মত জার্মান দেশে হানা দিতে করিল। এই মঙ্গোলীয়গণের ভিতর ম্যাগেয়ার নামক এক উপজাতি ছিল। তাহারা হাঙ্গেরীতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল এবং সেখান হইতে সমগ্র পূর্ব-ইউরোপ বিধ্বস্ত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ছিল সুদক্ষ অশ্বারোহী। এত দ্রুত তাহারা চলাফেরা করিত যে গুরুভার লৌহবর্মে আবৃত জার্মান যোদ্ধারা কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ক্রমশঃ এমন অবস্থা দেখা দিল যে ম্যাগেয়ারগণকে বাধা দিবার আর কোন উপায়ই তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইল না।

এই সময়ে স্যাক্সনির ডিউক হেনরি জার্মান দেশ রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। সমগ্র পূর্বসীমান্তে তিনি ঘন ঘন দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং দেশের অধিবাসীদিগকে যথাসম্ভব সেই সকল দুর্গের নিকটে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করিলেন। ফলে সীমান্ত বরাবর বহু সুরক্ষিত ঘাঁটি গড়িয়া উঠিল এবং ম্যাগেয়ারগণ যখন পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিল, তখন এই সব ঘাঁটিতে পদে পদে তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইভাবে তাহাদের উপদ্রব বহুলাংশে

কমিয়া গেল। স্যাক্সনির ডিউকের প্রতি জার্মান জাতির কৃতজ্ঞতার আর সীমা রহিল না।

এই সময়ে (৯১৯ খ্রীস্টাব্দে) সম্রাট শার্লামেনের শেষ বংশধর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জার্মান দেশের উপর আধিপত্যের দাবি করিবার অধিকারী কেহই রহিল না। এই অবস্থায় ডিউক হেনরিকে জার্মানীর একাধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জার্মান জাতি ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সম্ভ্রান্ত সমাজ একত্র হইয়া তাঁহাকে জার্মান জাতির রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। জার্মান জাতির ইতিহাসে একতা আনিবার চেষ্টা বলিতে এইটিই প্রথম।

শতধা-বিচ্ছিন্ন জার্মান জাতির ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ঐক্যবদ্ধ করার এই প্রথম চেষ্টা যতই দুর্বল হউক, ইহার ভিতরে এমন একটা স্বীকৃতি ছিল যাহার ভবিষ্যৎ গুরুত্ব পরবর্তী ইতিহাস মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। সে-স্বীকৃতি এই যে মূলতঃ জার্মান-ভূখণ্ডের সমস্ত অধিবাসীই এক ও অবিভাজ্য। এই সময় হইতেই সমগ্র দেশটার একটি কেন্দ্রগত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়।

সামন্ত-তন্ত্র

সেই ধারাবাহিক বিবরণ আরম্ভ করিবার পূর্বে দেশটির তখনকার অবস্থা একবার পর্যালোচনা করিয়া লওয়া উচিত। সমগ্র ইউরোপে তখন নূতন এক শাসন-প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছে, জার্মানীতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নর্ম্যানগণের আক্রমণের আশঙ্কায় সারা মহাদেশই তখন ভীত। যে-কোন সময় যে-কোন অঞ্চলে তাহাদের

উপস্থিতি অসম্ভব ছিল না। অথচ তাহাদের আকস্মিক আক্রমণে বাধা দিবার মত শক্তিমান্ রাজার একান্তই অভাব। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালী—সর্বত্রই এক অবস্থা। সমস্ত দেশটাই বহুখণ্ডে বিভক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী কাউণ্ট বা ডিউক উপাধি লইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া আছেন, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বলিতে কোথাও কিছু নাই। তাহা না-থাকার দরুণই এই ভূস্বামীদের হাতে যথাসম্ভব সামরিক শক্তি দিবার প্রয়োজন দেখা দিল। ইহা হইতেই সামন্ত-তন্ত্রের (Feudal System) উৎপত্তি।

সামন্ত-তন্ত্রের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে দেশের সমস্ত ভূমির মালিকানা স্বত্বের একমাত্র অধিকারী ছিলেন রাজা। রাজার নিকট হইতে কাউণ্ট প্রভৃতি ভূস্বামীরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিকার লাভ করিতেন ; তাহার পরিবর্তে বিপদকালে সৈন্য ও অর্থ দিয়া রাজাকে সাহায্য করার দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল। এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য তাঁহারা সর্বদাই নিজের অধীনে রাখিতেন।

ভূস্বামীরা এই সৈন্যদল এবং সৈন্যসম্ভার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হইতে পাইতেন ? তাঁহারা আবার নিজের নিজের অধিকৃত অঞ্চল বহু অংশে বিভক্ত করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূস্বামীদের ভিতর তাহা বিলি করিয়া দিতেন। এই নিম্নতন ভূস্বামীরা উপরিস্থ মালিককে ঠিক একইভাবে সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। এইভাবে ধাপে ধাপে নামিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম ভূ-স্বামীরা থাকিতেন। ক্ষুদ্রতমগণেরও নিজস্ব কেল্লা ও সৈন্য থাকিত, সে-সৈন্যের সংখ্যা যতই কম হউক।

এইভাবে খোদ রাজার সমস্ত ক্ষমতা ভূস্বামীদের হাতে গিয়া পড়িল। তাঁহাদের নিজেদের বিচারালয় ছিল, অধীন প্রজাগণকে তাঁহারা খুশীমত শাস্তি দিতে পারিতেন। নিজের এলাকার ভিতরে তাঁহারা স্বাধীন রাজার মতই আচরণ করিতে পারিতেন। এই স্বাধীনতা ত্যাগ করিবার কথা কল্পনা করিতে হইলেও তাঁহারা অধৈর্য হইয়া পড়িতেন। এইজন্য দেশে শক্তিমান্ কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তিত করার চেষ্টাকে তাঁহারা চিরদিন প্রাণপণে বাধা দিতেন।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাদের এই বাধা অপেক্ষাকৃত সহজেই দূর করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মানী ও ইতালীর এদিক দিয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ছিল। ঐ দুই দেশে ভূস্বামীদের ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা সহজসাধ্য হয় নাই। বহু শতাব্দীর চেষ্টায় তবে তাঁহাদিগকে বশে আনিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিমান্ করা সম্ভব হইয়াছিল।

যাজক-তন্ত্র

সামন্ত-তন্ত্রের পাশাপাশি গজাইয়া উঠিয়াছিল যাজক-তন্ত্র। অনেক যাজক আবার সামন্তপর্যায়ভুক্ত ছিলেন।

পোপের এইরূপ নির্দেশ ছিল যে, কোন যাজক পোপ ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে নত হইতে বাধ্য নহেন। ফলে যাজক-সামন্তেরা অনেক সময়ে রাজাকে মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিতেও কার্পণ্য করিতেন।

প্রজাসাধারণের উপর যাজকদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি ব্যাপারেই লোককে ধর্মশাস্ত্রের বিধান অর্থাৎ

যাজকদের আদেশ মানিয়া চলিতে হইত। অথচ এই সব আদেশ অনেক সময়ে হয়ত বাইবেলের তাৎপর্যের বিরোধীই হইত। নিরক্ষর গ্রামবাসীরা বাইবেলের খবর রাখিত না, যাজকগণের মুখের কথাকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া মনে করিত।

একদিকে সামন্ত-তন্ত্র, অন্যদিকে যাজক-তন্ত্র—ইহাদের মধ্যে পড়িয়া দরিদ্র ভূমিদাসগণের দুর্গতির আর সীমা ছিল না। তাহারা প্রাণপণে খাটিয়া যাইত, পরিবর্তে যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন বস্ত্রও পাইত না। বন্য পশুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বন্য পশুর মতই দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করিতে তাহারা বাধ্য হইত। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে যাজক-গণের দ্বারে ধর্ণা দিত—তাঁহারা দেবদূতগণকে প্রসন্ন করিয়া প্রাকৃতিক উৎপাত বন্ধ করিতেন। আবার শস্য ফলিয়া উঠিলে ভূস্বামীর লোক আসিয়া তাহা ক্রোক করিয়া বসিত—নিয়মিত খাজনা তাহারা সর্বাগ্রে লইয়া যাইবে।





………বিদ্যুতের জ্যোতি
তীব্রালোকে ক্ষণমাত্র উজলি আকাশ
ঝলসিয়া আঁখি পাছে ডুবায় আঁধারে।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু (পৃথ্বীরাজ কাব্য)

জার্মান জাতির প্রথম রাজা হেনরি রাজপদ লাভের পর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পর ঐ পদের অধিকারী হন তাঁহারই পুত্র অটো। পরবর্তী কালে তাঁহাকে মহান্ অটো (Otto the Great) বলিয়াই লোকে জানিত।

অটো কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে রাজপদ লাভ করেন নাই। হেনরির মৃত্যুর পর সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীরা নূতন করিয়া রাজা নির্বাচনের

জন্য একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই অটোকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই ভাবে রাজা-নির্বাচনের উপরে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সম্ভ্রান্ত সমাজ রাজার নিজের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবার দিকে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মনের অভিপ্রায় এই ছিল যে বহিঃশত্রুদের আক্রমণের কালে দেশরক্ষার দায়িত্বই রাজার থাকিবে, দেশের অভ্যন্তরে তিনি বিশেষ কোন ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন না, সে ক্ষমতা আগের মতই ভূস্বামীদের হাতে থাকিবে।

শক্তিশালী ভূস্বামীদের ক্ষমতা নষ্ট করিতে না পারিলে যে রাজার নিজের মর্যাদা পদে-পদে ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা অটো গোড়া হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সে-দিকে মনোযোগ দেওয়ার কল্পনাও হয়ত তাঁহার ছিল। কিন্তু সে-কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কোন উদ্যমই তাঁহার দিক হইতে আসিল না। তিনি জার্মানীর বাহিরের ব্যাপারে অত্যধিক মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। ইতালী হইতে পোপ দ্বাদশ জন (John XII) তাঁহাকে সম্রাট্ হইবার জন্য রোমে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অটো যদি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া জার্মান রাজ্যটিকে শৃঙ্খলার ভিতরে আনিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বিসমার্কের বহু শত বৎসর পূর্বেই জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিত। শক্তিশালী রাজাদের চেষ্টায় সামন্ত-তন্ত্র যে দূর করা যাইতে পারে, তাহা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজারা ইতিপূর্বেই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সাফল্য লাভ করিবার মত শক্তি ও বুদ্ধি অটোরও

ছিল। তিনি নেতৃত্ব করিবার জন্যই জন্মিয়াছিলেন ; নির্ভীক ও একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তিনি। দীর্ঘ উন্নত বীর মূর্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম দেখাইতে বাধ্য হইত। চেষ্টা করিলে জনগণের সমর্থন লাভ করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইত না।

কিন্তু তিনি সেদিক দিয়া গেলেন না। জার্মানীর রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইবার অল্প দিন পরেই তিনি পোপের আহ্বানে রোমে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং তাহার পরিবর্তে পোপের ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করিয়া দ্বাদশ জনকেই মধ্য-ইতালীর শাসক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পোপকে শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে বারবার রোমে যাইতে হইয়াছিল। ফলে জার্মানীর নিজস্ব ব্যাপার সম্পর্কে চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার খুব কমই ছিল।

পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য

অটো হইতে ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল, উহারই নাম হইল "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য" (Holy Roman Empire) ; কারণ ধর্মগুরু পোপ এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। শার্লামেনকে অবলম্বন করিয়া পূর্বেও এইভাবে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা একবার হইয়াছিল। কিন্তু শার্লামেনের মৃত্যুর পরেই সে কল্পনা ত্যাগ করা হয়।

এবার কিন্তু সম্রাট্‌পদ ধারাবাহিকভাবে জার্মান নরপতিগণ কর্তৃক পূর্ণ হইতে লাগিল। যদিও এ-পদ নির্বাচনসাপেক্ষ ছিল, উত্তরাধি-

কারসূত্রে কেহই প্রাপ্ত হইতেন না, তাহা হইলেও জার্মান শাসকগণের ভিতর হইতেই সম্রাট্-নির্বাচনের প্রথা সর্ববাদিসম্মতভাবে স্বীকৃত হইল। সাতজন জার্মান সামন্ত একত্র হইয়া এই নির্বাচন সমাধা করিতেন, তাঁহাদিগকে বলা হইত 'ইলেক্‌টর' (Elector) বা নির্বাচনকারী।

শার্লামেনের সাম্রাজ্যের সঙ্গে অটোর সাম্রাজ্যের কিন্তু বেশ পার্থক্য ছিল। শার্লামেন ছিলেন প্রায় সমস্ত ইউরোপের অধীশ্বর। কিন্তু অটোর আধিপত্য শুধু জার্মানী ও ইতালীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ শার্লামেন নিজের সাম্রাজ্যের ভিতর স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় শাসনদণ্ড চালনা করিতেন। অটোর আদেশ বা নির্দেশ তাঁহার পরাক্রান্ত সামন্তেরা ইচ্ছা করিলেই উপেক্ষা করিতে পারিতেন।

অটো গৌরব পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত শক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। নিজের কর্মস্থান স্বদেশের বাহিরে অপসারিত না করিলে তিনি বোধ হয় শক্তি লাভ করিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে জার্মানীরও অনেক উপকার তিনি করিতে পারিতেন।

জার্মানীর সে-উপকার ত' তিনি করিলেনই না, উপরন্তু তিনি যে কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গেলেন, তাহার ফলে চিরদিনের জন্য জার্মানীর কল্যাণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইল। ইহার পরে জার্মান সামন্তগণের ভিতর যিনি যখন পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেন, তিনিই সম্রাট্ হইবার স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিতেন এবং পোপের আহ্বান পাইলেই আল্পস্ পর্বতের ওপারে গিয়া পরদেশ ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া জড়িত হইয়া পড়িতেন। জার্মান ঐক্যের পথে এই সম্রাট্‌পদলোভী শাসকেরাই ছিলেন প্রধান বাধা।

অটো দি গ্রেটের সঙ্গে পোপ জন্-এর যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রায় এক শতাব্দী কাল অব্যাহত ছিল। ইহার মধ্যে কয়েকজন সম্রাট্ ও কয়েকজন পোপ নির্বাচিত হইয়া কালক্রমে পরলোক গমন করিলেন। অবশেষে নবম লিও পোপ হইলেন (১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে)। তিনি ছিলেন ক্লুনিয়াক সম্প্রদায়ের লোক। এই ক্লুনিয়াকগণের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

খ্রীষ্টধর্মের ভিতরকার সমস্ত আবর্জনা দূর করিয়া উহাকে সক্রিয় করিয়া তোলাই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে সারা ইউরোপে তাঁহারা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অগণ্য সংসারত্যাগী পণ্ডিত লোক এই সমস্ত মঠে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনায় কালক্ষেপ করিতেন ও ধর্ম-সংস্কারের উপায় চিন্তা করিতেন।

তাঁহাদের পরিচালক ক্লুনিক অবশেষে এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে ধর্মব্যাপারে কোন রাজ্যশাসকের কোন হাত থাকিতে পারে না, ও-বিষয়ে বিধি-নির্দেশ দেওয়ার একমাত্র অধিকারী হইলেন পোপ। আরও একটি মতবাদ তিনি ঐ সঙ্গেই প্রচার করিতে লাগিলেন—দেশের অধিবাসীদের কল্যাণের পক্ষে তাহা আরও সাংঘাতিক। তাহা হইলে এই যে—মঠ বা মঠাধিকারী যাজকগণের অধিকৃত কোন সম্পত্তির উপর দেশের রাজার কোন অধিকার থাকিবে না, এবং সেই সব সম্পত্তি দখল করিয়া থাকার দরুণ যাজকেরা রাজার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেও বাধ্য থাকিবেন না।

এখন ফ্রান্স ও জার্মানীতে যাজকগণ বহু বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ও বিরাট রাজপ্রাসাদের অধিকারী হইয়া বসিয়াছিলেন। সেগুলির

উপর রাজার যদি কোন অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ত' রাজাকে আর রাজাই বলা চলে না। এই মতবাদ হইতে যাজকসম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজশক্তির প্রবল বিরোধ বাঁধিয়া উঠিবে, তাহা সেই যুগেই শাসকেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই ক্লুনিয়াক যাজক-গণের প্রতিপত্তি যাহাতে বাড়িতে না পারে, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসকেরা নিজেরা জনপ্রিয় ছিলেন না, কাজেই তাঁহাদের সে-চেষ্টায় জনগণের কোন সমর্থন লাভ করিতে পারিলেন না। ফলে তাঁহারা এদিক দিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন।

গ্রেগরি ও হেনরি

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্লুনিয়াক যাজকসম্প্রদায় এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাদেরই মনোনীত নবম লিও পোপের আসনে উন্নীত হইলেন। ঠিক সেই সময়েই যাজকরা সারা ইউরোপে নিজেদের অধিকারের ভিতর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। এই উগ্র শক্তি কামনা একেবারে চরমে উঠিল পোপ সপ্তম গ্রেগরির সময়। তিনি দাবি করিয়া বসিলেন যে সমগ্র খ্রীষ্টজগতের উপর পোপের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ পোপেরাই হইবেন সম্রাটের উপরের সম্রাট্। ইচ্ছা করিলে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট্কে তাঁহারা পদচ্যুত করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, এই দাবির প্রতিবাদ আসিল সম্রাটের নিকট হইতে।

তখন সম্রাট্ ছিলেন চতুর্থ হেনরি। তিনি ছিলেন অতি অল্পবয়স্ক

অনভিজ্ঞ ও একগুঁয়ে। পোপের দাবির প্রতিকূলতা করা যে কতখানি বিপজ্জনক ব্যাপার, তাহা উপলব্ধি করিবারও শক্তি তাঁহার ছিল না। নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্য জার্মান প্রজাদেরও সহানুভূতি তিনি অর্জন করিতে পারেন নাই। কাজেই বিপদের সময় তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইবার কেহই ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে কী হয়, দিগ্বিদিক বিচার না করিয়া তিনি অজ্ঞাত বিপদের ভিতর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তিনি পোপ গ্রেগরির দাবির উত্তরে এক অপমানজনক পত্র প্রেরণ করিলেন।

তখন পোপ তাঁহাকে রোমে আসিয়া তাঁহার আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

সে-আদেশ যখন পালিত হইল না, তখন পোপ ঘোষণা করিলেন যে সম্রাট্ চতুর্থ হেনরিকে খ্রীস্টধর্মের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত করা হইল। সিংহাসনের উপর তাঁহার আর কোন দাবি রহিল না। এমন কি, আইনের আশ্রয়ও এখন হইতে তিনি দাবি করিতে পারিবেন না। এই কঠোর আদেশের নাম হইল বহিষ্করণ (Ex-communication)। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে বহিষ্কৃত সম্রাট্‌কে কেহ হত্যা করিলেও সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে না।

এতদিনে হেনরির চৈতন্য হইল। ক্লুনিয়াক যাজকগণের বহু শতাব্দীর আপ্রাণ চেষ্টায় ইতিমধ্যে দেশের জনসাধারণ পোপের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পোপের আদেশ যখন প্রচারিত হইল, তখন ছোট-বড় সকল জার্মানই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে পোপ কর্তৃক অভিশপ্ত ও বহিষ্কৃত সম্রাটের প্রতি কোন

আনুগত্যই আর তাহাদের নাই। যে-কোন মুহূর্তে সিংহাসনচ্যুত হইবার সম্ভাবনা প্রবল দেখিয়া সম্রাট অতি দ্রুত সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন।

সেই দারুণ শীতকালে তুষারাচ্ছন্ন আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া হেনরি রোমে ছুটিয়া আসিলেন। তখন কিন্তু পোপ আপেনাইন পর্বতের ক্যানোসা দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাট্‌কে সেইখানে ছুটিতে হইল। ক্যানোসার সিংহদ্বারের বাহিরে সম্রাট্‌কে তিন দিন বরফের বৃষ্টি মাথায় করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তারপর পোপ দয়া করিয়া দরজা খুলিলেন। পোপ আদেশ করিলেন যে অপরাধীর বেশে পোপের আদালতে হাজির হইয়া সম্রাট্‌কে বিচারার্থ দাঁড়াইতে হইবে। সেই বিচারে যদি তিনি নির্দোষ প্রতিপন্ন হন, তবেই তিনি আবার রাজমুকুট ধারণের অধিকার লাভ করিবেন।

নিরুপায় হইয়া হতভাগ্য সম্রাট্‌কে তাহাই স্বীকার করিতে হইল। যথাকালে বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। সারা ইউরোপে এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিল। এতকাল লোকে পোপ অপেক্ষা সম্রাট্‌কেই পরাক্রান্ত বিবেচনা করিত। এখন তাহাদের ভুল ভাঙ্গিল। তাহারা দেখিল যে পোপের একটিমাত্র মুখের কথাতেই সম্রাটের শির হইতে মুকুট খসিয়া পড়ে। ভয়ে ও ভক্তিতে তাহারা ধর্মগুরু পোপের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

পোপের এই মর্যাদাবৃদ্ধি আকস্মিক ভাবে ঘটে নাই। সামান্য রোমের বিশপ হইতে তাঁহারা তিলে তিলে ধাপে ধাপে ইউরোপের

ধর্মগুরুর আসনের পানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রোম নগর ছিল সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট পলের সাধনার পীঠস্থান। এই স্থানেই তাঁহারা যীশুখ্রীষ্টের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। পোপেরা বলিতেন যে তাঁহারা সেণ্ট পিটারের মর্যাদার উত্তরাধিকারী। গোঁড়া ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা এই দাবী নতশিরে মানিয়া চলিত। মানিতেন না কেবল কনস্টান্টিনোপলের পেট্রিয়ার্ক এবং মানিত না জার্মান দেশের আর্যমতের খ্রীষ্টানেরা।

কিন্তু ক্লুনিয়াক যাজকগণের বহু বৎসরব্যাপী অক্লান্ত প্রচারে জার্মান খ্রীষ্টানগণ ইতিমধ্যে আর্যমত ত্যাগ করিয়া গোঁড়া ক্যাথলিক মতের অনুগামী হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বের মত আর্যমতের প্রভাব যদি জার্মানীতে থাকিত, তবে কখনই পোপের বহিষ্করণের আদেশ শুনিয়া জার্মান জনগণ সম্রাট্‌কে অশ্রদ্ধা করিতে রাজী হইত না।

জগতের চক্ষে অতিমাত্র অপদস্থ হইয়াই হেনরি জার্মানীতে ফিরিলেন। কিন্তু অপদস্থ হইয়াও তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আবার জাতিতে উঠিয়াছেন, প্রজারা আবার তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। তাহা যদি হয়, তবে ভবিষ্যতে এ-অপমানের শোধ তিনি অবশ্যই তুলিতে পারিবেন।

হইলও তাই। এক বৎসর পর্যন্ত গোপনে তিনি নানাভাবে প্রস্তুত হইলেন। তারপর হঠাৎ সসৈন্যে সম্রাট্ হেনরি ইতালীতে উপনীত হইলেন। পোপ কোন ব্যবস্থা করার সময়ই পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তিনি চারিদিকে সাহায্য চাহিয়া

পাঠাইলেন, কারণ সম্রাটের সৈন্য-বাহিনীর ভিতর ত' বহিষ্করণের আদেশ পৌঁছাইবে না।

পোপের সাহায্যে আসিল সিসিলির নর্ম্যানগণ। তাহারা হেনরিকে রোম হইতে হঠাইয়া দিল বটে, কিন্তু রোম লুণ্ঠন করিল। ইহাতে রোমের অধিবাসীরা এরূপ রাগিয়া উঠিল যে নর্ম্যানগণ চলিয়া যাওয়া মাত্র তাহারা পোপকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিল। পোপ স্যালার্নোতে পলায়ন করিলেন ও সেখানে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

বাণিজ্যের প্রসার ও শিক্ষা

এই যুগ কি রাজনৈতিক, কি নাগরিক, কি বাণিজ্যিক—সকল দিক দিয়াই ভবিষ্যৎ কালের সমৃদ্ধির সূচনা করিতেছিল।

সৈন্য-চলাচলের প্রয়োজনে আল্পস্ পর্বতের ভিতর দিয়া রাজপথ গড়িতে হইয়াছিল। ব্রেনার গিরিসংকটের ভিতর দিয়া এই পথ আল্পস্ অতিক্রম করিয়া দানিয়ুবের তীর পর্যন্ত গিয়াছিল এবং নদী পার হইয়া উত্তর সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে এই পথ দিয়া ভিনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রধান বন্দরে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল। কাজেই এই সুদীর্ঘ রাজপথটির সাহায্যে বাণিজ্যের প্রসার হইতেছিল দ্রুতবেগে।

দানিয়ুবের উত্তরে স্ট্রাসবার্গ পর্যন্ত, এবং তারপর রাইন নদীর তীর ধরিয়া উত্তর-সমুদ্র পর্যন্ত, এই পথের পাশে পাশে বহু বাণিজ্য প্রধান নগর দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেখানেই কোন

নদীর সহিত এই রাজপথের মিলন হইয়াছিল, সেইখানেই বড় বড় হাটবাজারের সূচনা দেখা গিয়াছিল; কালক্রমে সেই সব ব্যবসা-কেন্দ্রের আশেপাশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ছোট বড় বহু নগর। ভেরোনা, মিউনিক, উল্‌ম্‌, নিউরেম্‌বার্গ প্রভৃতি নগর অবশ্য পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। কিন্তু এই রাজপথ তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাওয়ায় ঐ সব নগরের সমৃদ্ধি বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সব নগরেই বণিকেরা দ্রুত অর্থশালী হইয়া উঠিতেছিল, এবং তাহার ফলে স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের স্বেচ্ছাচার মানিয়া চলিতে দিন দিনই তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল।

বড় বড় নগরের কথা বাদ দিলে, পল্লী-অঞ্চলেও বাণিজ্যের বিস্তার কম হইতেছিল না। রাজপথ খুব কম জায়গাতেই ছিল, পায়ে-চলা সরু পথ ধরিয়া ফিরিওয়ালারা মাথায় করিয়া বাণিজ্যের জিনিস বহিয়া লইয়া যাইত। গ্রামে গ্রামে মেলা বসিত, এই সব মেলায় সেই সব জিনিস বিক্রয় করিয়া তাহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিত। মেলা-গুলিতে দেশ-বিদেশের লোক আসিত। নানাজাতীয় পশু-পক্ষী সেখানে প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইত। বিবিধ আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা সেখানে ছিল। বিদেশ হইতে আগত পথিকদের মুখ হইতে সমুদ্রপারের কাহিনী শুনিবার জন্য গ্রামবাসীরা খুবই কৌতূহল প্রকাশ করিত। এই সব মেলার অস্তিত্ব এখনো আছে। আগেকার সে বাণিজ্যিক গুরুত্ব আর ইহাদের নাই বটে, কিন্তু তবু লোকে সাময়িক আমোদ-প্রমোদের লোভে মেলা দেখিতে আসে।

বিদেশ হইতে আগত এই পথিকেরা যে সকলেই শুধু কৌতূহলের

বশবর্তী হইয়াই দেশ ভ্রমণ করিতেন তাহা নহে, অনেকে আবার জ্ঞানের অন্বেষণেই দূর-দূরান্তরের যাত্রা ছিলেন। কোন বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভের জন্য শত শত ক্রোশ দূর হইতে পাহাড়, জঙ্গল ভাঙ্গিয়া শিক্ষার্থীরা আসিতেছে, এমন দৃশ্য তখনকার দিনেও দেখা যাইত। শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় তাঁহারা আবার পথের পাশে উপস্থিত জনতাকে শিক্ষা দান করিতে করিতে পথ চলিতেন। এইভাবে পরোক্ষ উপায়ে জ্ঞানের বিস্তারও কিছু কিছু হইতেছিল।

জনসাধারণের মনে জ্ঞান অর্জনের একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মের গোড়ার কথা এই ছিল যে, পৃথিবী অতি হীন স্থান এবং মনুষ্য-জন্ম অতি হেয় বস্তু। এখানে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, কষ্ট ভোগ করা ভিন্ন গতি নাই। সুখ যদি পাইতে হয়, তবে তাহা পরলোকে—এবং সে-পরলোকের চাবিকাঠি যাজকগণের হাতে। কাজেই পরলোকে যাহারা সুখ চাহিবে, যাজকদিগকে মান্য করা ছাড়া তাহাদের গতি নাই।

কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে স্বাধীন চিন্তার উৎস গ্রীক সাহিত্যের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। গ্রীসের পণ্ডিতদের মতে এই পৃথিবীই একটি সুখের স্থান। পাহাড়, ঝরণা, অরণ্য, সমুদ্র সবই মানুষকে আনন্দ দিবার জন্য যেন উৎসুক। চোখ মেলিয়া দেখিলেই যে-কোন মানব তাহাদের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে।

এই মতবাদের কথা শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার ফলে গোঁড়া খ্রীষ্টানগণেরও যাজকদের প্রতি ভক্তি কতকটা কমিয়া আসিতে

লাগিল। যাজকেরা অসুবিধায় পড়িলেন এবং জন-সাধারণের পক্ষে শিক্ষা যে মারাত্মক জিনিস, তাহাই প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

শিল্প ও সাহিত্য

ইউরোপের সকল স্থানে এই সময়ে স্থাপত্য-শিল্পের উপর শাসক সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। কলোন নগরের বিখ্যাত গির্জা এই সময়ই নির্মিত হয়।

জার্মানীতে সাহিত্যচর্চারও সূত্রপাত এই যুগেই। এতদিন লাটিন ভিন্ন অন্য কোন ভাষার চর্চা এদেশে ছিল না। কিন্তু এইবার গ্রাম্য অখ্যাত কবিযশঃপ্রার্থীরা অকস্মাৎ মুখে মুখে গান বাঁধিতে আরম্ভ করিল। স্বদেশীয় বীরগণের কীর্তিকাহিনী অবলম্বনেই এই সব গানের পালা রচিত হইত।

প্রাচীন জার্মান উপকথার প্রসিদ্ধ বীর সিগফ্রিডের কাহিনী এবং পরবর্তী কালের ট্রিস্টান, পার্সিভেল প্রভৃতি যোদ্ধগণের বীরত্বকথাই ছিল এই সব পালার কাহিনী। ইহা ছাড়া প্রেম সম্পর্কীয় কিছু কিছু গীতিকবিতাও রচিত হইয়াছিল।

আর একটি বিষয়ে নূতন ভাবধারার সূচনা হইয়াছিল এই যুগেই। নারীর স্থান জার্মান সমাজে এতদিন পর্যন্ত খুব সম্মানজনক ছিল না। দরিদ্রের গৃহে নারী ছিল ভারবাহী পশুর মত, ধনীর প্রাসাদেও সে পুরুষের সম্পত্তি বলিয়াই পরিগণিত হইত।

কিন্তু গীতিকবিতা রচনার পরোক্ষ ফলস্বরূপ নারীর এই দুরবস্থার

পরিবর্তন সুরু হইল। কবিগণ যাহাকে দেবীর আসন দিতেছেন, সমাজে সে পশুর মত হইয়া থাকিবে, ইহা সকলের চোখেই বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। ফলে দেশে নারীর জন্য এক নূতন সম্ভ্রমবোধ জাগিয়া উঠিল। বীরগণের বীরব্রতের (chivalry) মূলমন্ত্রই হইল নারীর মর্যাদারক্ষা। যশস্বী বীরগণ নিজ নিজ প্রণয়িনীর রুমাল বা ওড়না পতাকারূপে উর্ধ্বে তুলিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন।

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও মহিলারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন না। এতদিন ধর্মমহামণ্ডলের কোন পদে নারীর অধিষ্ঠান কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু এখন নারীদের জন্যই পৃথক মঠ স্থাপিত হইল। উচ্চ-বংশীয়া মহিলারা সেই সকল মঠের অধিনেত্রী হইলেন। রাজদরবারে এবং পোপের দরবারে তাঁহাদের জন্য উচ্চ সম্মানের আসন নির্দিষ্ট রহিল।

নগর সমবায়

আগেই বলা হইয়াছে যে সৈন্যচলাচলের পথ ধরিয়া জার্মানীর নদীতীরে ও গিরিবর্ত্মের মুখে বহু বাণিজ্যপ্রধান ছোট বড় নগরের উদ্ভব হইয়াছিল এই যুগে। বাণিজ্যের আদানপ্রদানবশতঃ এই সব নগর অল্পকাল মধ্যেই ধনসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ধনী বণিক্-গণের সম্মুখে উপস্থিত হইল এক গুরুতর সমস্যা। তাহাদের এই ধনসম্পদ্ রক্ষা করিবে কে? দেশে কোন কেন্দ্রীয় রাজশক্তি নাই, ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা পরস্পরের সহিত কলহরত। বিশেষতঃ, তাহারা সবাই অতিমাত্র লোভী। বাণিজ্যবন্দর রক্ষার ভার তাহাদের উপর দিলে

তাহারাই ভক্ষক সাজিয়া বণিক্‌গণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবে। এ অবস্থায় নিজেদের রক্ষার ভার নিজেরা লওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

অনেক চিন্তা করিয়া এই নূতন নগরগুলি কয়েকটি নগর-সমবায় গঠন করিল। নিকটবর্তী কয়েকটি নগর পারস্পরিক রক্ষণাবেক্ষণের সর্তে সন্ধিবদ্ধ হইয়া এক একটি শক্তিমান্ সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিল। এইভাবে ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের লুণ্ঠন হইতে আত্মরক্ষার একটা উপায় আবিষ্কার করিয়া তাহারা নিশ্চিন্তমনে বাণিজ্যের বিস্তারে মনোযোগ দিল। এই নগর-সমবায়গুলির ভিতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল হ্যান্‌সিয়াটিক লীগ।





ধর্ম্মযুদ্ধের অভিযাত্রী

চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধুমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে!

—মাইকেল মধুসূদন (মেঘনাদবধ কাব্য)

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত স্যাক্সনির অধীশ্বরগণই জার্মানীর রাজা রূপে নির্বাচিত হইতে থাকিলেন। ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা পরিত্যক্ত হইল। নির্বাচক সামন্তগণ (Electors) বিবেচনা করিলেন যে আর বেশীদিন স্যাক্সনির সামন্ত পরিবারকে এই উচ্চতম

সম্মান ভোগ করিতে দিলে উহা তাঁহাদের বংশগত অধিকাররূপে গণ্য হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শুধু এই কারণেই তাঁহারা স্যাক্সনি পরিবারকে বাদ দিয়া হোহেনস্টফেন বংশীয় কনরাডকে রাজা রূপে নির্বাচন করিলেন। সোয়াবিয়া ও ফ্রাঙ্কোনিয়াতে এই বংশের বড় জমিদারী ছিল। রাজা হইয়া কনরাড এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কনরাডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ব্যাভেরিয়ার ডিউক হেনরি। তাঁহার সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। যুদ্ধে ডিউকের পরাজয় হইল। একটা বিশেষ ঘটনার জন্য এই যুদ্ধ স্মরণীয় হইয়া আছে।

একদিন কনরাড ডিউক হেনরিকে এক গিরিদুর্গে ঘিরিয়া ফেলিলেন। বন্দী অবস্থায় বহুদিন কাটিয়া গেল। রাজা কনরাডের অন্য স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি আটক ডিউককে বলিয়া পাঠাইলেন—"অকারণ কেন সৈন্যক্ষয় করিতেছ? আত্মসমর্পণ কর।" ওদিকে ডিউকেরও কষ্টের অবধি ছিল না। অনাহারে প্রাণত্যাগের চেয়ে আত্মসমর্পণ করা তাঁহার কাছে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে হইল। তিনি কনরাডের প্রস্তাবে রাজী হইলেন।

রাজা দয়া প্রকাশ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে দুর্গস্থিত নারীরা স্বচ্ছন্দে যথা ইচ্ছা যাইতে পারে। তাহাদিগকে কেহ আটক করিবে না। তখন ডিউকের পক্ষ হইতে বলা হইল—এই দুর্জয় শীতের দিনে নারীরা একবস্ত্রে কোথায় যাইবে? পথে বাহির হইয়া শীতে মারা পড়া অপেক্ষা বন্দী থাকা ভাল।

রাজা আরও উদারতা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—

"নারীগণকে একবস্ত্রে যাইতে হইবে না। নিজের পিঠে যতটা জিনিস বহন করা যায়, প্রত্যেক নারী তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। বসনভূষণ, খাদ্যবস্তু, এমন কি ধনরত্ন, যাহা খুসী তাহারা লইয়া যাউক, রাজার তাহাতে আপত্তি হইবে না।"

এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নারীগণ দুর্গ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তোরণ উন্মুক্ত হইলে সর্বপ্রথম দুর্গ হইতে বাহির হইলেন ডিউকপত্নী। তাঁহার পিঠে বসনভূষণ নয়, খাদ্যবস্তু নয়, এমন কি ধনরত্নও নয়, স্বয়ং ডিউককে ডিউকপত্নী বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

তাঁহার পশ্চাতে শত শত নারী সারি দিয়া যাইতেছেন, প্রত্যেকের পিঠেই একটি করিয়া পুরুষ, কাহারও বা স্বামী, কাহারও পিতা, ভ্রাতা বা পুত্র। দুর্গের সমস্ত যোদ্ধাই নারীদের সাহায্যে মুক্তিলাভ করিতে যাইতেছে!

নিজ সৈন্যদের সহিত কনরাড পাশে দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রীরা রাগিয়া বলিলেন—"ইহা সন্ধির সর্তের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। নারীগণ যোদ্ধাগুলিকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইবেন, এমন অনুমতি রাজা দেন নাই। পুরুষগুলিকে আটক করা হউক। তাহা না করিলে যুদ্ধ আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে।"

কনরাড কিন্তু এই কথায় কান দিলেন না। তিনি বলিলেন—"নারীগণ যাহা পিঠে বহন করিয়া লইতে পারিবে, তাহাই লইয়া যাইবার অনুমতি আমি দিয়াছিলাম। সে-প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ

করিতে পারিব না।" বিনা বাধায় মহিলাগণ পিঠের বোঝা লইয়া খুশীমত চলিয়া গেলেন।

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ডিউক হেনরি চূড়ান্তভাবেই পরাজিত হইলেন। তবে বন্দী হওয়ার মত অবস্থায় তিনি আর কখনও পড়েন নাই, সসম্মানেই সন্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের অবসানের অল্প পরেই 'ধর্মযুদ্ধে'র আহ্বানে জেরুজালেমে গিয়া সেখানেই কন্‌রাডের মৃত্যু হইল।

ফ্রেডারিক বার্বারোসা

অতঃপর জার্মানীর রাজারূপে নির্বাচিত হইলেন কন্‌রাডেরই ভ্রাতুষ্পুত্র—ফ্রেডারিক। হোহেনস্টফেন বংশের সম্রাট্‌দের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, লাল দাড়ির জন্য লোকে তাঁহাকে 'বার্বারোসা' বলিয়া ডাকিত। 'বার্বারোসা' শব্দের অর্থ 'লাল দাড়ি-ওয়ালা'।

রাজা হইয়া ফ্রেডারিক নিজেরই প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার দিকে মন দিলেন। প্রথমেই তিনি দৃষ্টি দিলেন জার্মানীর বাহিরে। এদিকের পথ তাঁহার খোলাই ছিল। রোম নগরে গিয়া সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হওয়া তিনি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। দুই শতাব্দী পূর্বে অটো যেরূপে পোপ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ফ্রেডারিকও সেই ভাবে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাহার পরই স্বয়ং পোপের সহিত ফ্রেডারিকের বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। পোপ বড়, না সম্রাট্ বড়—এই প্রশ্ন লইয়াই বিবাদ। এ-কলহের মীমাংসা কিছুতেই হইল না।

অবশেষে সাময়িকভাবে এ-কলহ বন্ধ রহিল ফ্রেডারিকের ক্রুসেড যাত্রার দরুণ। হোহেনস্টফেনদের রাজত্বকালেই সম্রাট্ ও পোপের কলহ চরমে উঠিয়াছিল।

ক্রশ হইল খ্রীষ্টধর্মের পবিত্র প্রতীক চিহ্ন। কারণ ক্রশ কাষ্ঠের উপরেই যীশুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। ক্রুশের বা খ্রীষ্টধর্মের মঙ্গলের জন্য বারবার ইউরোপের খ্রীষ্টান নরপতিরা জেরুজালেমের তুর্কীশাসকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ফ্রেডারিককেও ১১৮৯ খ্রীস্টাব্দে এইভাবে ধর্মযুদ্ধে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। এই ক্রুসেড হইতে তিনি আর ফিরিতে পারেন নাই। একটি দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

যাত্রার পূর্বে সিসিলির রাজকন্যার সঙ্গে তিনি নিজপুত্র হেনরির বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে হেনরি জার্মানীর রাজা, সিসিলির রাজা এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ এই তিন পদে একাই অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি ছিলেন অতি উচ্চাশাপরায়ণ। পিতৃশত্রু পোপকে বিতাড়িত করিয়া রোমের রাজ্যখণ্ড নিজে গ্রাস করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সমগ্র জার্মানী ও ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার স্বপ্নও তিনি দেখিতেছিলেন।

কিন্তু ১১৯৭ খ্রীস্টাব্দে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার পুত্রের বয়স মাত্র তিন বৎসর। এই পুত্রের নাম ফ্রেডারিক। তিন বৎসরের এই শিশুকেই সিসিলির রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তাহার মাতা রাজপ্রতিনিধিত্ব করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যে এই রাজ-মাতারও মৃত্যু হইল। তখন তৃতীয় ইনোসেন্ট রোমের পোপ।

সিসিলির শিশু-রাজার অভিভাবকত্ব তিনিই যাচিয়া গ্রহণ করিলেন; উদ্দেশ্য ছিল শিশুটিকে পোপের একনিষ্ঠ ভক্তরূপে গড়িয়া তোলা।

এই শিশুর পিতা এবং তাঁহার পিতামহ ও প্রপিতামহ সকলেই ছিলেন জার্মানীর রাজা। কিন্তু জার্মানীর নির্বাচক সামন্তরা বিদেশস্থ এক শিশুকে রাজপদে নির্বাচিত করার কোন সার্থকতা দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা অন্য কাহাকেও নির্বাচন করার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজপদের প্রার্থী ছিলেন দুই ব্যক্তি—গুয়েলফ্ রাজকুমার অটো এবং সোয়েবিয়ার রাজপুত্র ফিলিপ। এই ফিলিপ ছিলেন পরলোকগত সম্রাট্ হেনরির ভ্রাতা। এই কারণেই পোপ ইনোসেণ্টের বিষদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। তিনি অটোর দাবিই সমর্থন করিলেন। পূর্ববর্তী পোপগণ অপেক্ষা ইনোসেণ্ট অনেক বেশী ক্ষমতাবান্ ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিতে নির্বাচকেরা সাহসী হইলেন না। জার্মানীর রাজারূপে গুয়েল্ফ বংশীয় অটো নির্বাচিত হইলেন। হোহেনস্টফেন বংশ হইতে সাময়িকভাবে রাজপদ বাহিরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক

কিন্তু ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপের ইঙ্গিতে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাস এই গুয়েল্ফ অটোকে রাজ্যচ্যুত করিলে, আবার জার্মানীতে নূতন রাজা নির্বাচনের প্রয়োজন হইল। ততদিন সম্রাট্ ষষ্ঠ হেনরির পুত্র এবং সিসিলির রাজা ফ্রেডারিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পোপের

অভিভাবকত্বে মানুষ হওয়ার দরুণ তিনি একান্তভাবে রোমেরই অনুগত ছিলেন। এইজন্য পোপ তাঁহাকে জার্মানীর রাজপদের জন্য প্রার্থি-রূপে খাড়া করিলেন। পোপের অনুরোধে নির্বাচকগণ ফ্রেডারিককেই নির্বাচিত করিলেন। রাজপদ আবার হোহেনস্টফেন বংশেই ফিরিয়া আসিল। ফ্রেডারিকের উপাধি হইল দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। শার্লা-মেনের রাজধানী আকেন নগরে তিনি সম্রাট্‌পদেও অভিষিক্ত হইলেন।

পোপের একান্ত আগ্রহে কিছুদিন হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল যে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যে যখন যিনি সম্রাট্‌পদের অধিকারী থাকিবেন তাঁহাকেই জেরুজালেমে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে —সেই পবিত্রভূমিকে সেলজুক তুর্কীগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য। দ্বিতীয় ফ্রেডারিককেও এইরূপ যুদ্ধযাত্রার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইল, পোপেরই অনুরোধে। কিন্তু ধর্মযুদ্ধে যাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাহার চেয়ে নিজের রাজ্যখণ্ডগুলিকে সুশাসনে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা তাঁহার বিবেচনায় অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্মযুদ্ধে যাত্রা না করিয়া তিনি পারিলেন না।

১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে মিসরের সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া ফ্রেডারিক স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যখন আরবের মরুভূমিতে খ্রীষ্টধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন রোমের প্রাসাদে বসিয়া খ্রীষ্টধর্মগুরু গ্রেগরি সকল রকম উপায়ে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে-ছিলেন। এমন কি ফ্রেডারিকের উপর বহিষ্করণের আদেশ প্রচার করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেই আক্রোশে স্বদেশে

ফিরিয়াই ফ্রেডারিক রোম নগর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু গ্রেগরিকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। গ্রেগরি এই সময়ে মারা যান।

ফ্রেডারিকের তখন এরূপ ক্ষমতা ছিল যে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে পোপের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। তাঁহারই সমর্থনে চতুর্থ ইনোসেন্ট পোপ হইলেন। কিন্তু পোপের পদ লাভ করিয়াই তিনি উপকারী ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ ফ্রেডারিক বাঁচিয়া থাকিতে কোন পোপের পক্ষে আর পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব ছিল না।

ইনোসেন্ট সাহসী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইউরোপের সমস্ত রাজাকে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। এমন কি ফ্রেডারিকের পিতৃভূমি জার্মানীতেও সম্রাটের বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিন পোপের নায়কত্বে পরিচালিত বিবিধ শত্রুর সাহিত যুদ্ধ করিয়া ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে অবসন্ন হৃদয়ে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই সম্রাট্‌পদের গৌরব ও ক্ষমতা চিরতরে লুপ্ত হইল।

ফ্রেডারিক হোহেনস্টফেন বংশেরই রাজা ছিলেন, কিন্তু জার্মানীর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ খুবই কম ছিল।

অরাজক জার্মানী

হোহেনস্টফেন সাম্রাজ্যের বিলোপের পর সারা জার্মানী গৃহ-বিবাদে পূর্ণ হইল, শাসন-শৃঙ্খলা বলিয়া কোন কিছুই রহিল না।

নগরের সহিত নগরের, ভূস্বামীর সহিত ভূস্বামীর সদা-সর্বদা বিবাদ চলিতে থাকিল। সামন্তদের অত্যাচার হইতে বণিক্ ও পথিকগণকে রক্ষা করিবার দায়িত্বও কেহ স্বীকার করিয়া লইতে রাজী ছিল না।

ফ্রান্সের রাজারা এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ লইয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্য বাড়াইতে লাগিলেন, শীঘ্রই লীজ ও নামুর দুর্গ এবং ফ্ল্যাণ্ডার্সের এক বড় অংশ তাঁহাদের হাতে আসিল।

হোহেনস্টফেন বংশের পতন হইলে জার্মানী দুই তিনশত প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। সম্রাট্‌দের দেশে দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং পোপ ও ইতালীর নগরগুলির সঙ্গে তাঁহাদের অনুক্ষণ ঝগড়াবিবাদের সুযোগ লইয়া ছোট ছোট রাজ্যের সামন্ত শাসকবৃন্দ ক্রমেই স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, এখন তাঁহারা আর কোন বাধাই মানিলেন না। বস্তুতঃ জার্মান রাজ্য অথবা "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য" বলিয়া তখন আর কিছু থাকিল না। গর্বিত হোহেনস্টফেন রাজাদের অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভ্রান্ত নীতির ফলেই ইহা হইল। জার্মানী ও ইতালী দেশ যে অনেক শতাব্দী পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বিভেদে পূর্ণ ছিল তাহার জন্য এই নীতি কম দায়ী নয়।

অখ্রীষ্টানগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যে-সব সন্ন্যাসী যোদ্ধা বা নাইটরা জীবন পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর ছিলেন টিউটন নাইট সন্ন্যাসীরা। তাঁহারা জার্মানীর পূর্ব দিক রক্ষার ভার লইলেন। প্রাসিয়ার পূর্ব অংশে ও সাইলেশিয়ায় বহু সংখ্যক শ্লাভ আসিয়া ইতিমধ্যে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল, আর হাঙ্গেরীর এক বৃহৎ অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ম্যাগেয়ারেরা। টিউটন

সন্ন্যাসীরা এই সকল অঞ্চল হইতে আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করিলেন এবং তাহাদের বাসস্থানে জার্মান কৃষকদের আনিয়া বসতি করাইলেন। এই সকল অঞ্চল স্থায়িভাবে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এইরূপে পরবর্তী প্রাসিয়ার একটা বড় অংশের সৃষ্টি হইল।

হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া এবং পোল্যাণ্ডেরও বহু অংশে ঐ একই ভাবে জার্মান উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে-সকল স্থান জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণেই জার্মান সংখ্যালঘুগণকে লইয়া ঐ ঐ প্রদেশের শাসকগণ চিরদিনই নানা অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন।

হ্যাপস্‌বুর্গ বংশ

এই সময়ে অস্ট্রিয়াতে হ্যাপস্‌বুর্গ বংশের অভ্যুদয় হইল। ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের রুডলফ্ সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহাদের আদি বাস ছিল সুইজার্লাণ্ডের লুসার্ন হ্রদের তীরে। হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়ার সিংহাসনের উপরে তাঁহাদের বরাবরই দৃষ্টি ছিল, এবং ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারা এই দুই প্রদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। কালক্রমে অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গেরা ব্যতীত সম্রাট্ পদবী ধারণের উপযুক্ত লোক জার্মানীতে আর রহিল না। সম্রাট্-নির্বাচনের অধিকার এই সময়ে সাতজন সামন্তের হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু হ্যাপস্‌বুর্গ বংশের বাহিরে তাঁহারা কখনোই সম্রাট্ খুঁজিতে যাইতেন না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই বংশের যিনি সম্রাট্ পদের

অধিকারী ছিলেন তাঁহার নাম সিজিসমন্ত। একটি লজ্জাকর ঘটনার সহিত তাঁহার নাম জড়িত হইয়া রহিয়াছে। পোপবিরোধী এক অধ্যাপক যাজকের মৃত্যুর জন্য তিনি পরোক্ষভাবে দায়ী ছিলেন। এই যাজকের নাম হাস।

প্রটেস্টাণ্ট্

খ্রীস্টধর্মগুরু পোপেরা শতাব্দীকাল হইতেই লোকচক্ষে মর্যাদাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেরা ছিলেন বিলাসী, চরিত্রহীন ও অকর্মণ্য, এবং তাঁহাদের দরবারও অনুরূপ চরিত্রের কর্মচারীতে পূর্ণ থাকিত। দুর্নীতির প্লাবনে ধর্মমহামণ্ডল ডুবিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। তাহার উপর ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৩৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রীস্টান জগতে পোপ ছিলেন দুইজন। তাঁহাদের ভিতর কলহের অন্ত ছিল না।

এই সব কারণে ইউরোপের সমস্ত দেশে জনসাধারণ চাহিতেছিল যে যাজকগণের জীবননীতি ও ধর্মনীতির একটা আশু পরিবর্তন হউক। ইংলণ্ডের উইক্লিফ ও প্রাগের হাস এই পরিবর্তনের দাবী তুলিয়া পোপের ধর্মবিধানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। "প্রতিবাদ" কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ "প্রোটেস্ট্" হইতে এই আন্দোলনকারীরা "প্রটেস্টাণ্ট্" নাম প্রাপ্ত হইল।

ইহাদিগের বক্তব্য শুনিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য সম্রাট্ সিজিসমন্ত কনস্টান্স নগরে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। হাসকে সেই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সম্রাট্

তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে বিরোধের মীমাংসা হউক বা না হউক, তাঁহাকে নিরাপদে প্রাগে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে। সেই আশ্বাসের উপরে নির্ভর করিয়া হাস কনস্টান্সে আসিলেন। কিন্তু তাহাকে হাতে পাইয়া গোঁড়া ক্যাথলিক-সম্প্রদায় আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। তাঁহাকে ধর্মদ্বেষী নাম প্রদান করিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিল।

ইহার পর হাসের মতাবলম্বীদের বা হাসাইট্‌দের সায়েস্তা করিবার জন্য ক্যাথলিকগণ তাহাদের বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করিল। প্রাগবাসীরাই ছিল হাসের প্রধান শিষ্য। ইহাদের সহিত ক্রুসেড যোদ্ধাদের যুদ্ধ চলিল বারো বৎসর। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রাগ-বাসীরাই জয়ী হইল।

অবশেষে ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম মার্টিন ব্যাসেলের সভাতে প্রাগবাসীদের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ইহাতেই প্রটেস্টাণ্টগণ চিরতরে নীরব হইল না।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার

১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটিল। গুটেনবার্গ কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। পৃথিবীতে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জ্ঞানালোকের বিস্তারে জার্মানীর ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

আরবদের অনুকরণে ছেঁড়া কাপড়ের মণ্ড হইতে কাগজ তৈয়ারীর কৌশলও এই সময়ে ইউরোপবাসীরা জানিতে পারিল।



ভাঙো, ভাঙো পাষাণ কারা!

ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্।

-রবীন্দ্রনাথ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি গ্রীক সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল একটি অভূতপূর্ব কারণে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীগণ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অধিকৃত হইয়াছিল। সমগ্র নগর নির্মমভাবে লুণ্ঠিত হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া বহু গ্রীক পণ্ডিত নিজেদের অমূল্য হস্তলিখিত গ্রন্থরাজি লইয়া কনস্টান্টিনোপল হইতে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে পলায়ন করিতে বাধ্য

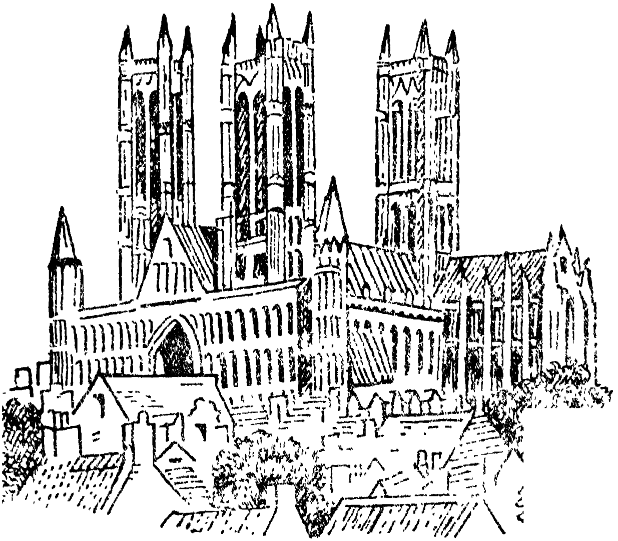
হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত-সমাজ জ্ঞানচর্চায় ও সুকুমারশিল্পে গ্রীক ও রোমকগণের উন্নতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলেন। ইহারই নাম রেনেসাঁস (Renaissance) বা নব জাগরণ।

জার্মানীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও এই নবজাগরণের ঢেউ সেখানকার জনগণমনেও বিপুল সাড়া জাগাইয়া তুলিল। জার্মানীর দক্ষিণ অংশেই ইহার প্রভাব বেশী অনুভূত হইয়াছিল। সাধারণতঃ জার্মান জনসাধারণ শিল্পকলার দিকে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। কারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানকার জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য ছিল বেশী। ইহা সত্ত্বে ব্রোঞ্জ ও দারুমূর্তি নির্মাণের বিদ্যায় জার্মান শিল্পীরা কতকটা কৃতিত্ব প্রকাশে সমর্থ হইলেন।

ইঁহাদের মধ্যে লুকাস কার্নাক ও আলব্রেক ডুরার প্রথম শ্রেণীর ইতালীয় শিল্পীদের সহিত তুলনীয়। ইঁহাদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। ধর্মসম্পর্কিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন-কিছু লইয়া ইঁহারা শিল্পসৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহার কারণ বোধ-হয় এই যে ধর্ম-সংস্কারের প্রশ্ন তখনকার জার্মানীকে প্রবলভাবে নাড়া দিতেছিল।

স্থাপত্যবিজ্ঞানে জার্মানীর এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তাহা গথিক রীতি নামে পরিচিত। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রভাবে এ-দিকেও বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হইল। আণ্টোয়ার্পের টাউন হল ও হিদেল-বার্গের দুর্গনির্মাণে এই পরিবর্তিত রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণ আন্দোলনের প্রথম উন্মেষ হয় ইতালীতে। সেখানে ইহা শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পথেই অগ্রসর হইয়াছিল। আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া এই জাগরণের সাড়া যখন জার্মানীতে আসিল, তখন সেখানে ইহা অনেকাংশে



গথিক রীতি অনুসারে নির্মিত গীর্জা

নূতন রূপ গ্রহণ করিল। জার্মানেরা ছিল স্বাধীনচেতা, অবিলাসী ও ধর্মনিষ্ঠ। তাই রেনেসাস যখন তাহাদের মনকে মুক্ত করিল তখন স্বভাবতঃই তাহাদের দৃষ্টি যাজকশ্রেণীর অনাচার ও দুর্নীতির উপর পড়িল। কাজেকাজেই জার্মানীতে নবজাগরণের প্রবাহ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথে ছুটিল।

মার্টিন লুথার

রোমক ধর্মমহামণ্ডলের (church) অনাচারের বিরুদ্ধে উইক্লিফ ও হাস প্রমুখ প্রচারকগণ তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। হাসের প্রাণদণ্ডের ফলে সে-প্রতিবাদ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া ছিল। কিন্তু জনসমাজ একবার জাগ্রত হইলে অত্যাচারের দ্বারা তাহাদের ক্ষোভ দমন করিয়া রাখা যায় না। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর নূতন এক প্রচারক রোমীয় যাজক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া প্রতিবাদের সুর তুলিলেন। ইঁহার নাম মার্টিন লুথার।

তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিচিত্র গল্প আছে। তিনি একদিন এক বন্ধুর সহিত বনের পথে বেড়াইতেছিলেন ; এমন সময়ে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত আরম্ভ হয়। ঠিক তাঁহার পাশে তাঁহার বন্ধু বজ্রপাতে নিহত হন। কিন্তু লুথার থাকেন অক্ষত। এই ঘটনায় তাঁহার মনে হইল—কোন বিশেষ কাজ তাঁহার দ্বারা করাইয়া লইবেন বলিয়াই ভগবান্ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। সেই দিন হইতেই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বহু দিন ধরিয়া তিনি ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিলেন এবং পরে স্যাক্সনি প্রদেশের রাজধানী উইটেনবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন।

ধর্মশাস্ত্র ভাল করিয়া পড়ার ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পোপ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মনীতি অনেক বিষয়ে বাইবেলের বিরোধী। এ অবস্থায় বাইবেলকে উপেক্ষা করিয়া পোপের ব্যবস্থা মানিয়া

লওয়ার কোন কারণ তিনি দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ করিয়া, পোপ কর্তৃক নানা ছলে খ্রীষ্টানগণের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের



মার্টিন লুথার

রীতিকে তিনি জোর গলায় নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন ইহার ফলে তিনি পোপ ও সম্রাট্—উভয়েরই বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন।



গ্রেট ইলেকটর

পৃঃ—৭৫

তখন পঞ্চম চার্লস সম্রাট্ পদে অধিষ্ঠিত। তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ছাড়া সমগ্র ইউরোপের অধীশ্বর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হ্যাপ্‌সবুর্গ সম্রাট্ ম্যাক্সিমিলিয়ানের তিনি ছিলেন পৌত্র। ওদিকে স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড ছিলেন তাঁহার মাতামহ। শৈশবেই তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি যখন উনিশ বৎসরের বালক মাত্র, তখন তাঁহার পিতামহ ও মাতামহ উভয়েই স্বর্গগমন করেন।

কাজেই অস্ট্রিয়া সহ জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড, স্পেন, ইতালী এবং নূতন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের সুবিস্তীর্ণ স্পেনিশ উপনিবেশগুলি সবই একসঙ্গে তাঁহার অধীন হইল। অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ, প্রতিভাহীন, ক্ষীনস্বাস্থ্য এই যুবক যে বেশীদিন এই বিরাট সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন, এ-কল্পনা কেহই করে নাই।

কিন্তু চার্লস প্রমাণ করিলেন যে, তাঁহাকে যতটা অসহায় মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নন। তিনি নিরলস কর্মী ছিলেন, এবং একমাত্র পরিশ্রমের জোরেই তিনি সমস্ত বাধা কাটাইয়া উঠিলেন। জীবনের বারো আনা অংশই তিনি শিবিকায় কাটাইয়াছিলেন। অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবার মত স্বাস্থ্য তাঁহার ছিল না বলিয়া শিবিকাতেই তিনি ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া বেড়াইতেন। এইভাবেই তিনি সাম্রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, এইভাবেই বারবার তুর্কীদিগকে সাম্রাজ্য-সীমা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, গোঁড়া ক্যাথলিক চার্লস পোপবিরোধী লুথারের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে রাজী ছিলেন না। কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তিনি

লুথারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন (১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে)। লুথার আসিলেন না, ফলে তিনি আইনের আশ্রয়চ্যুত বলিয়া ঘোষিত হইলেন ; অর্থাৎ অতঃপর যে-কেহ তাঁহাকে দেখিলেই হত্যা করিতে পারিবে, সম্রাট্ এইরূপ আজ্ঞা দিয়া রাখিলেন।

লুথারের সৌভাগ্য যে সম্রাট্ শীঘ্রই জার্মানী হইতে অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইলেন। বস্তুতঃ চার্লসের সাম্রাজ্য এত বড় ছিল এবং সে-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এত বিভিন্ন রকম সমস্যা সর্বদা সম্রাটের ব্যক্তিগত মনোযোগের অপেক্ষায় জমিয়া থাকিত যে, চার্লস কোন-এক স্থানেই একসঙ্গে বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না।

চার্লস চলিয়া যাওয়াতে লুথার আপাততঃ রক্ষা পাইলেন। স্যাক্সনির ইলেক্টর (নির্বাচক) ডিউক তাঁহাকে লুকাইয়া নিজের দুর্গে আশ্রয় দিলেন। সেই দুর্গে বসিয়া লুথার পোপীয় ধর্মনীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। উইটেনবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সেই প্রবন্ধগুলি লাখে লাখে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকিল।

সমগ্র জার্মানীতে লুথারের মতাবলম্বীরা সংখ্যায় বাড়িয়া চলিল। সম্রাট্ চার্লস পরে যখন সেখানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন লুথারকে বন্দী করা আর সহজ ছিল না, কারণ তাহা করিলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটার আশঙ্কা ছিল।

রোমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় উইক্লিফ ও হাস এবং তাঁহাদের মতাবলম্বীরা প্রটেস্টান্ট্ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। লুথারও এখন হইতে সেই নামেই পরিচিত হইতে লাগিলেন। যাজকগণের বিরুদ্ধে

জার্মান শাসকগণ পূর্ব হইতেই অসন্তোষ পোষণ করিতেছিলেন। কারণ যাজক-সম্প্রদায়ের অধিকৃত ভূমি বা সম্পত্তির উপর কোনরূপ কর ধার্য করা চলিত না। এইজন্য জার্মানীর অধিকাংশ শাসক লুথারের মতাবলম্বী হইয়া প্রটেস্টাণ্ট্-সম্প্রদায়কে বলবান্ করিয়া তুলিলেন। অল্পদিনের ভিতরই অর্ধেক জার্মানীতে বিশেষ করিয়া উত্তর ভাগে এই নূতন ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল।

এদিকে সুইজার্লাণ্ডে জুইংলী ও জেনোয়াতে কল্‌ভিনও পোপের বিরুদ্ধে দল গঠন করিলেন। তাঁহাদের প্রটেস্টাণ্ট্‌বাদ লুথারের মতবাদ অপেক্ষা অনেকাংশে উগ্রতর ছিল। সে যাহা হউক, মার্টিন লুথারই যে পোপ-বিরোধী ধর্মপ্রচারকদের ভিতর সকলের অগ্রণী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার আবির্ভাব না ঘটিলে ধর্ম-বিষয়ে পোপের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না।

ষোড়শ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে দুইটি—খ্রীষ্টধর্মের সংস্কার এবং সামন্ততন্ত্রের ক্রমিক তিরোধান। সামন্ততন্ত্রের গোড়ার কথা ছিল ভূমিস্বত্ব ভোগের পরিবর্তে সামরিক সাহায্য-প্রদান। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই ভূমির উপর জনসাধারণের মোহ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে অনেক লোক ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়া উঠিল। বহুলোক আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। এমন অনেক সার্বভৌম নরপতি বিভিন্ন দেশে দেখা দিলেন যাঁহারা সামন্তগণের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া বেতনভুক্ সৈন্যের সাহায্যে নিজেদের অধিকার রক্ষা করা শ্রেয়ঃ

বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সব কারণে সামন্তপ্রথার মূলেই কুঠারের আঘাত পড়িল।

তথাপি এ কথা বলা চলে যে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় জাতিগণের মূল সম্পদই ছিল ভূমি। বহু লোক বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইলেও ভূমির উপর তখনও অনেকেরই দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল।

বৃহৎ শিল্পের যুগ তখনও আসে নাই। পৃথিবী যেন সাগ্রহে সেই যুগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কারণ বাণিজ্যের অগ্রগতি সত্ত্বেও কৃষির উপর যে একান্ত নির্ভরতা তখন পর্যন্ত জনসাধারণের ভিতর ছিল, তাহার বিলোপ ঘটাইবার জন্য প্রয়োজন ছিল শুধু ব্যাপকভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা। তাহা সুরু হইলেই মধ্যযুগের সঙ্গে নবযুগের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইবে।

হ্যাপ্‌সবুর্গবংশীয়েরা ছিলেন বংশানুক্রমে অস্ট্রিয়ার অধীশ্বর; তাহা ছাড়া সম্রাট্‌বংশ বলিতেও তাহাদিগকেই বুঝাইত, কারণ চার শতাব্দী ধরিয়া তাঁহাদের বংশের বাহিরে কেহ সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। কালক্রমে ঐ রাজ্যই সমগ্র জার্মানীতে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি অর্জনে সমর্থ হইল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এ-যুগে অস্ট্রিয়া-জার্মানীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ-সাম্রাজ্যের ভিতরে ছিল তিন শতেরও বেশী ছোট-বড় রাজ্য। রাজ্যগুলির আয়তনেও যেমন বিস্তর তারতম্য ছিল, শাসকগণের উপাধিতেও ছিল তেমনি বৈচিত্র্য। কেহ রাজা, কেহ

ডিউক, কেহ বিশপ, আবার কেহ বা আর্চবিশপ। প্রত্যেক রাজ্য হইতে নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য লইয়া একটি সম্মিলিত সাম্রাজ্যিক বাহিনী গঠনের রীতি বরাবরই বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু সে-বাহিনী একস্থানে একত্র করা প্রায়ই সম্ভব হইত না।

প্রত্যেক রাজ্যের শাসকই প্রকৃতপ্রস্তাবে ষোল আনা স্বাধীন ছিলেন, তিনি নিজের নামে মুদ্রা চালাইতে পারিতেন, নিজ ক্ষমতায় কর ও শুল্ক আদায় করিতে পারিতেন, এমন কি সন্ধি-বিগ্রহ করা ও প্রজাগণ কী-ধর্মের অনুসরণ করিবে— তাহার নির্দেশ দেওয়ারও অধিকার তাঁহার ছিল। কাজেই প্রাচীন পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে এ-যুগের ঐ-নামীয় সাম্রাজ্যের কোনই মিল ছিল না।

সর্বত্রই দুর্নীতির প্লাবন, সর্বত্রই অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা। নাগরিক জীবনের মর্যাদা ছিল না, মধ্যযুগের শেষভাগে যে-সব উন্নতিশীল বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র শিল্পসমবায় গড়িয়া উঠিল, তাহারাও ধ্বংসোন্মুখ। পোপের বিরোধী প্রটেস্টান্ট্ ও পোপের অনুগত ক্যাথলিকগণের ভিতর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে সভ্যতাই বিনষ্ট হইতে চলিয়াছিল।

অধিকাংশ লোকই ছিল সামান্য কৃষক, এক মুঠা খাদ্যের পরিবর্তে তাহারা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইত। রাজার জন্য বিনা-পারিশ্রমিকের কাজ (বেগার) এত বেশী পরিমাণে করিতে তাহারা বাধ্য ছিল যে নিজের জমি চাষ করিবার সময়ই তাহারা পাইত না। রাত্রে চাঁদ উঠিলে তখন তাহারা সেই আলোকে নিজেদের জমি চষিত। অনেক শাসক আবার জোর করিয়া প্রজা-

গণকে বিদেশী রাজার জন্য যুদ্ধ করিতে পাঠাইতেন, তাহাদের বেতন বাবদ বহু অর্থ আদায় করিয়া নিজেরা আত্মসাৎ করিতেন।

জার্মানীতে ১৬১৮-১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিশবৎসরব্যাপী এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। প্রটেস্টাণ্ট্ ও ক্যাথলিক ধর্মপন্থীদের বিরোধকে আশ্রয় করিয়া প্রথম এই যুদ্ধ সুরু হয়। ক্রমে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশ নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে, জার্মানীর গৃহবিবাদের সুযোগ লইয়া এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। এই দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে জার্মানীরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

রাজনৈতিক ভাবে জার্মানী এত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে যে বহুদিন পর্যন্ত আর দেশের ঐক্যের আশা ছিল না। অগণিত লোক যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে মারা যায়। কৃষি ও শিল্প একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। এই যুদ্ধে জার্মানীর এত ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছিল যে দুই শত বৎসর পরে বিসমার্ক দুঃখ করিয়াছিলেন যে, তখন পর্যন্তও জার্মানী এই ত্রিশবৎসরব্যাপী যুদ্ধের দুর্ভোগ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

গ্রেট ইলেকটর

তিনশতাধিক জার্মান রাষ্ট্রের ভিতর প্রাশিয়াই সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন ব্রাণ্ডেনবুর্গকে কেন্দ্র করিয়াই এই রাজ্যের উৎপত্তি। জার্মানীর পূর্বসীমান্তে এই রাজ্যের অবস্থিতি। জার্মান-সীমান্তের বাহিরেও প্রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত ছিল। জার্মানীর প্রটেস্টাণ্ট্ রাজ্যসমূহের মধ্যে এইটিই ছিল বৃহত্তম। এ-রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হোহেনজোলার্ন বংশীয় গ্রেট ইলেকটর, ফ্রেডারিক

উইলিয়ম (১৬৪০-১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার সামরিক সাফল্যের জন্যই দেশবাসী তাঁহাকে নাম দিয়াছিল "গ্রেট ইলেকটর"।

গ্রেট ইলেকটরের দীর্ঘ রাজত্বে ব্রাণ্ডেনবুর্গ উত্তর জার্মানীর প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনি ব্রাণ্ডেনবুর্গ তথা প্রাশিয়ার সর্ববিধ উন্নতি সাধন করেন। ত্রিশবৎসরব্যাপী যুদ্ধের শেষে সন্ধির দ্বারা তিনি ব্রাণ্ডেনবুর্গের আয়তন বৃদ্ধি করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রেডারিক দি গ্রেট যে অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে প্রাশিয়ার হস্তে জার্মানীর প্রভুত্ব কাড়িয়া আনিতে পারিয়াছিলেন তাহা গ্রেট ইলেকটরের কৃতিত্বপূর্ণ নীতির জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। গ্রেট ইলেকটরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র প্রথম ফ্রেডারিক ব্রাণ্ডেনবুর্গের অধিপতি হন। তিনিই প্রথম রাজা উপাধি লাভ করেন। প্রথম ফ্রেডারিকের পরে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম।

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়মের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মিতব্যয়িতা। একটি পয়সা বাঁচাইবার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার রাজসভা সর্বপ্রকার আড়ম্বর-বর্জিত ছিল। তিনি প্রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও একটি শক্তিমান্ সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়মের পুত্র ফ্রেডারিকই ইতিহাসে ফ্রেডারিক দি গ্রেট নামে পরিচিত। তিনি অনেক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। একাধারে রণ-পাণ্ডিত্য ও গভীর রাজনীতিজ্ঞানের

অধিকারী এই ফ্রেডারিকই প্রাশিয়াকে ইউরোপের ভিতর একটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কঠোর শাসনের ভিতর রাখিয়াছিলেন। এমন কি নিজের মাতার সহিতও ফ্রেডারিক দেখা করিতে পারিতেন না। শিক্ষক ও সৈনিকগণের সঙ্গেই তাঁহাকে জীবন কাটাইতে হইত। এই কষ্ট অসহ্য হওয়ায় তিনি আঠারো বৎসর বয়সের সময় পিতার প্রাসাদ হইতে পলাইয়া যান। কিন্তু অচিরাৎ তাঁহাকে আবার ধরিয়া আনা হইল। তাহার পলায়নের সাহায্যকারীরা তাঁহারই সম্মুখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল, এবং তিনি নিজে পূর্বের চেয়েও কঠোরতর শাসনের ভিতর বন্দীর মত বাস করিতে থাকিলেন।

যৌবনের এই শাসন-শৃঙ্খলা তাঁহার সৈনিক জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার অন্তরে দয়া-দাক্ষিণ্য গুণ যে ইহার দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহাও সুনিশ্চিত।

শৈশব হইতে একাকী থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া ফ্রেডারিক সারা-জীবনই বন্ধুহীনভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন; নিজের মনের কথা কখনও কাহাকেও জানিতে দিতেন না। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বদাই তিনি কপট ব্যবহার করিতেন। আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক ছিল তাঁহার চরিত্র। নিজের বুদ্ধিবল ভিন্ন অপর কোন-কিছুর উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। এক কথায়, তিনি ছিলেন ষোল-আনা স্বেচ্ছাচারী নরপতি।

বাহির হইতে কঠোর বলিয়া মনে হইলেও শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের তিনি রসগ্রাহী ছিলেন, ফরাসী ভাষায় তিনি কথা বলিতেন—এমন কি ফরাসী ভাষায় কবিতা পর্যন্ত লিখিতেন। ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি ফরাসী মনীষীর সহিত তাঁহার পত্রালাপ চলিত, এবং ফরাসী শিক্ষিত সমাজের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দৈনন্দিন জীবনে ধর্মকে উচ্চাসন দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সুখ ও দুঃখকে তিনি সমান জ্ঞান করিতেন এবং হৃদয়াবেগকে তিনি যুক্তির নীচে স্থান দিতেন। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আপত্তিকর আচরণে লিপ্ত হইতেও তিনি দ্বিধা করিতেন না।

তাঁহার পিতা অন্যদিকে যতই খারাপ থাকুন, তাঁহার জন্য পরিপূর্ণ কোষাগার ও সুশিক্ষিত সৈন্যদল রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রজাগণকে রাজার স্বেচ্ছাচার নত-মস্তকে মানিয়া চলিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। এই সব সুবিধা হাতে পাইয়া ফ্রেডারিক নিজেকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

প্রথমেই অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার নিকট তিনি দাবি করিলেন যে, যেহেতু সাইলেশিয়া জার্মান-প্রধান অঞ্চল, সেই-কারণেই প্রাশিয়ার হাতে উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই উপলক্ষে ফ্রেডারিককে দুইটি যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধেই সাইলেশিয়া অধিকৃত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধটা লড়িতে হইয়াছিল এই রাজ্যখণ্ডটিকে সম্মিলিত ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এই সময়ে ফ্রান্স তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিয়াছিল।

সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা দমিবার পাত্রী ছিলেন না। তিনি

সুকৌশলে ফ্রান্সকে ফ্রেডারিকের নিকট হইতে নিজের দলে টানিয়া লইলেন, এবং ফ্রেডারিকের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী রাশিয়া এবং পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী স্যাক্সনির নিকট হইতেও সহানুভূতি ও সাহায্য আদায় করিলেন। কিন্তু ওদিকে ইংলণ্ড তাহার দল ছাড়িয়া গেল। ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁহার তখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের রাজ্যাধিকার লইয়া ভীষণ শত্রুতা চলিয়াছে। সেই ফ্রান্স যখন মেরিয়া থেরেসার স্বপক্ষে লড়িতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়াই ইংলণ্ডকে ফ্রেডারিকের দিকে ঢলিয়া পড়িতে হইল।

ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেই ফ্রান্সের দিন কাটিয়া গেল, তাহার নিকট হইতে সম্রাজ্ঞী সক্রিয় সাহায্য কিছুই পাইলেন না। এদিকে ফ্রেডারিক স্যাক্সনি আক্রমণ করিলেন। সাত বৎসর ব্যাপিয়া এক মহাসমর আরম্ভ হইল।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সমগ্র প্রজাসংখ্যার নয় ভাগের এক ভাগ বিনষ্ট হইল। তাহাতেও ফ্রেডারিক থামিলেন না। যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যেরা পশ্চাৎপদ হওয়ার লক্ষণ দেখাইলে তিনি নিজে তাহাদের পশ্চাৎ হইতে হুংকার করিয়া উঠিতেন—"কুত্তার দল, চিরদিন কে কবে বাঁচিয়াছে ?"

মানুষের জীবনকে কোন মূল্যই তিনি দিতেন না। এই মহাযুদ্ধের পরে সাইলেশিয়া স্থায়িভাবে প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত রহিয়া গেল।

তাই বলিয়া ফ্রেডারিক যে মাত্র একজন বড় যোদ্ধা ভিন্ন অন্য কিছু ছিলেন না, তাহা নহে। উপরি-উক্ত যুদ্ধের পর তিনি তেইশ বৎসর প্রাশিয়া শাসন করেন, এবং এই দীর্ঘ সময়ে রাষ্ট্রের বহু কল্যাণ সাধন

করেন। বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা ও ক্ষমতায় তাঁহার সমকক্ষ লোক খুব কমই ছিল ; কিন্তু সেজন্য তিনি কখনও গর্ব করিতেন না।

নীল রংয়ের একটা পুরানো পোশাক পরিয়া, মেটে রংয়ের টুপি মাথায় দিয়া কালিশূন্য জুতা পায়ে তিনি প্রাসাদে ও দুর্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তাঁহার ভঙ্গী দেখিলেই লোকে চিনিতে পারিত যে তিনিই রাজা। পটস্‌ডাম দুর্গে পরিবার-পরিজন হইতে দূরে একাকী তিনি বাস করিতেন—সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের দর্শন দান, রাজকার্যে তদারক—এই সব লইয়াই তাঁহার দিন কাটিত। যখন সময় পাইতেন, একা বসিয়া বাঁশী বাজাইতেন।

শাসন-সংস্কার, কর-নির্ধারণের ব্যবস্থার উন্নতি বিধান এবং আইনের পরিবর্তন দ্বারা প্রাশিয়ার রাষ্ট্রকে তিনি শক্তিশালী করিয়াছিলেন। বহু জলা জমি হইতে জল নিষ্কাশন করিয়া তিনি উহা কৃষির উপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের বৎসরে খাজনা আদায় বন্ধ রাখিয়া এবং দরিদ্র চাষীদের ভিতর পুরাতন যুদ্ধের ঘোড়া বিতরণ করিয়া তিনি কৃষকদিগের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এক কথায়, তিনিই বর্তমান জার্মানীর স্রষ্টা। তিনটি মাত্র শব্দে তাঁহার রাজত্ব-কালের প্রকৃতি বুঝাইয়া দেওয়া যায়—তাহা হইল মনীষা, কর্মদক্ষতা ও একনায়কত্ব। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফ্রেডারিকের মৃত্যু হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফ্রেডারিক দি গ্রেটই ছিলেন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা অবশ্য সাধারণ রাজা ছিলেন। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রাশিয়ার সম্মান ও প্রভাবের অবনতি দেখা দেয়।



নূতনের আবির্ভাব

হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।
কোথা হ'তে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্‌-দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল।

—রবীন্দ্রনাথ

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের মৃত্যুর পর প্রাশিয়ার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম। তাঁহারই

রাজত্বকালে ফরাসী বিপ্লবের তাণ্ডবে সমগ্র ইউরোপ থরহরি কম্পিত হয়, এবং রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ভিতর পোলাণ্ডরাজ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বিভক্ত হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যু ঘটে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

তাঁহার পুত্র তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের রাজত্বকালে বিপ্লবী ফরাসীরা আসিয়া হানোভার অধিকার করিল। হানোভার তখন ইংলণ্ডের রাজার অধীন বটে, তথাপি এ-অঞ্চলে ফরাসী সৈন্যের অবস্থিতি জার্মানীর নিরাপত্তার পক্ষে আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে করা হইয়াছিল।

ওদিকে অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার চিরন্তন বৈরভাবের সুযোগ লইয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সচিব টালিরান্দ জার্মানগণের উপর নিত্যনূতন অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সব যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে প্রাশিয়া রহিল নিরপেক্ষ,—এবং জার্মানীর পশ্চিম অংশ যখন ফরাসীর চরণতলে দলিত হইতেছিল, তখন ফ্রেডারিক উইলিয়াম নিজ রাজ্যের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে মন দিলেন।

নেপোলিয়ন

ফ্রেডারিক উইলিয়াম কিন্তু শান্তি কামনা করিলে হইবে কি, ফরাসী দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা নেপোলিয়ন যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। ইংলণ্ডকে তিনি চিরশত্রু বলিয়া জানিতেন। সেই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সাহায্য তিনি চাহিয়া পাঠাইলেন। ফ্রেডারিক পড়িলেন মহা সংকটে। তিনি রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের

পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং রাশিয়ার সাহায্যের আশ্বাস লাভ করিয়া নেপোলিয়নের দাবি উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না (১৮০৪ খ্রীঃ)।

ইহার পরেই নেপোলিয়ন ফরাসী দেশের সম্রাট এবং ইতালির রাজা বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেন। অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের সমরনায়কগণ ইহার উত্তরে নিজেদের ভিতর এক সন্ধিস্থাপন করিলেন। তাহার সর্ত হইল এই যে ত্রিশক্তির সম্মিলিত সৈন্যদল অচিরেই ইউরোপের বিভিন্ন দিক হইতে ফরাসী প্রভুত্বের উপর আঘাত হানিতে আরম্ভ করিবে। প্রাশিয়া এই সন্ধিতে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও দ্বিধাগ্রস্তের মত কালক্ষেপ করিতে থাকিল।



নেপোলিয়ন

ওদিকে নেপোলিয়ন ঝটিকাবেগে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মিলিত সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, ফ্রেডারিকের রাজ্যের বিভিন্ন অংশ মথিত করিয়া ফরাসী সৈন্য চলাচল করিতে লাগিল। অচিরে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নেপোলিয়নের পদানত

হইল, এবং অস্ট্রারলিট্‌জের যুদ্ধে সম্মিলিত সৈন্য সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হইল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস ভীত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

এই সর্তে সন্ধি হইল যে তিনি আর জার্মান দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর সম্রাটোচিত প্রভুত্ব করিতে পারিবেন না। অস্ট্রিয়ার অধিকৃত বহু সমৃদ্ধ প্রদেশ নেপোলিয়ন কাড়িয়া লইলেন। ব্যাভেরিয়া ও উটেনবার্গের ইলেক্‌টর শাসকেরা "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ব্যাডেনের ইলেক্‌টরও অস্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। জার্মানদেশে সামান্য যেটুকু রাজনৈতিক ঐক্যের চিহ্ন ছিল, তাহাও নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

এই সংকটের সময়ে ফ্রেডারিক উইলিয়ামও নেপোলিয়নের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূত নেপোলিয়নের আদেশে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া আসিলেন। সেই সন্ধির সর্তানুযায়ী ফ্রেডারিক নিজ রাজ্যের কিছু অংশ নেপোলিয়নের হাতে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, পরিবর্তে পাইলেন হানোভার রাজ্য। কিন্তু হানোভার তখনও ইংরেজের অধিকারে রহিয়াছে, নামে-মাত্র সে-রাজ্যের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া ফ্রেডারিক প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রাইন লীগের সৃষ্টি করিলেন। ব্যাভেরিয়া ও উটেনবার্গের রাজগণ, মেঁইজের ইলেক্‌টর প্রভৃতি শাসকেরা জার্মান সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পারস্পরিক সন্ধিসূত্রে এই লীগ বা রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্য হইলেন। ইহার রক্ষাকর্তা

বা অভিভাবক হইলেন স্বয়ং ফরাসী-সম্রাট। তাঁহার আদেশে অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাট পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট উপাধি ত্যাগ করিলেন। এখন হইতে তাঁহার উপাধি হইল, অস্ট্রিয়ার সম্রাট (১৮০৬ খ্রীঃ)।

প্রাশিয়ার রাজা হানোভারও পাইলেন না, ওদিকে তাঁহার নিজস্ব অধিকারের ভিতর হইতে অনেকটা অংশ নেপোলিয়নের অধীনে চলিয়া গেল। তাহা ছাড়া, রাশিয়ার সম্রাট তাঁহাকে অনবরত উত্তেজিত করিতে থাকিলেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সময় হইতে প্রাশিয়ার সৈন্যদল রণ-দক্ষতায় ইউরোপে অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল। সেই সৈন্যদলের অধীশ্বর হইয়াও ফ্রেডারিক উইলিয়াম কি না বিনা যুদ্ধে নেপোলিয়নের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

জেনার যুদ্ধ

অবশেষে ফ্রেডারিক উইলিয়াম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নেপোলিয়নের অজেয় সৈন্যবাহিনী এল্‌ব পার হইয়া প্রাশিয়ার ভিতরে প্রবেশ করিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর জেনাতে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। দশ দিন পরে নেপোলিয়ন জার্মানীর বার্লিন নগরে সদম্ভে প্রবেশ করিলেন এবং জোর গলায় ঘোষণা করিলেন যে সমগ্র ইউরোপে যতদিন শান্তি স্থাপিত না হইতেছে ততদিন তিনি কোনমতেই বার্লিন ত্যাগ করিবেন না।

জার্মানি দেশ—



বিসমার্ক

প্রাশিয়ার রাণী লুইজি নিজে সন্ধি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নেপোলিয়নের মন গলিল না।

অগত্যা ফ্রেডারিক উইলিয়াম সপরিবারে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার হাতে কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। সেখানে দুর্গরক্ষী সৈন্যেরা প্রাণপণে ফরাসীদিগকে বাধা দিতে লাগিল।

যাহা হউক, ড্যানজিগের প্রসিদ্ধ দুর্গও নেপোলিয়ন দখল করিলেন। তখন আর কোন স্থানেই প্রাশিয়ার বাধা টিঁকিল না। পূর্ব সীমান্তের শেষ শহরও নেপোলিয়নের হাতে গেল। এইবার তিনি রুশ-সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে রুশ-সৈন্যের সহিত তাঁহাকে কয়েকটি ছোট ছোট যুদ্ধ করিতে হইল। তাহাতে কোন পক্ষেরই বিশেষ লাভ-ক্ষতি হইল না।

অবশেষে নীমেন নদীর বক্ষে একখানি ভেলার উপরে ফরাসী-সম্রাটের সহিত রুশ-সম্রাটের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইল এই সর্তে যে, প্রাশিয়ার অধিকারে পোলাণ্ডের যে-অংশ রহিয়াছে তাহা রাশিয়াকে দিতে হইবে, এবং রাশিয়া আইওনিয়ান সমুদ্রের মধ্যবর্তী কয়েকটি দ্বীপ নেপোলিয়নকে দিবে। এই সন্ধিতে ফ্রেডারিক উইলিয়ামকেও সম্মতি দিতে হইল। ইহার ফলে তাঁহার অবস্থা অতিমাত্র শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। ভগ্নহৃদয়ে রাণী লুইজিও এই সময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ফ্রেডারিক কিন্তু এই দৈন্য দশার ভিতরেও নৈরাশ্যে অভিভূত হইলেন না। প্রাশিয়ার যুবকগণকে দলে দলে সৈন্যদলে প্রবেশ

করিবার জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন। তাঁহার অধীনে যেটুকু রাজ্য ছিল, তাহার ভিতর নানাস্থানে এই তরুণের দল গোপনে শিক্ষা পাইতে লাগিল। সকলেরই মনে এই আশা যে নেপোলিয়নের এ-সৌভাগ্য কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

রুশ অভিযান

কয়েক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল ; অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। অবশেষে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়গর্বিত নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। জার্মানীর ভিতর দিয়াই তিনি অগ্রসর হইলেন। জার্মানদেশের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র হইতে শাসকেরা আসিয়া নেপোলিয়নের পৃষ্ঠরক্ষার কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ফরাসী-বাহিনীতে যে পাঁচ লক্ষ সৈনিক ছিল, তাহার অধিকাংশই জার্মান সৈন্য।

ড্রেসডেন নগরে সমস্ত জার্মান সামন্ত একত্রে আসিয়া নেপোলিয়নকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন ; তাঁহাদের সহিত প্রাশিয়ার রাজা এবং অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞীকেও আসিতে হইয়াছিল। শেষোক্ত দুইজনকে নেপোলিয়ন অতিমাত্র তাচ্ছিল্যের সহিতই গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু রুশ অভিযান হইতে সর্বস্বান্ত হইয়া নেপোলিয়নকে ফিরিতে হইল। ফিরিবার পথে জার্মানীর ভিতর দিয়া তাঁহাকে এক প্রকার পলাইয়া যাইতে হইয়াছিল। পাঁচ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে বিশ হাজারের বেশী ফিরিতে পারে নাই। রাশিয়ার ভীষণ শীতে এবং দুর্ধর্ষ কসাকগণের আক্রমণে অসংখ্য সৈন্য পথে পথে তুষারের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল।

এ-অবস্থায় জার্মানীকে পদানত রাখার আশা আর নাই। তাহা বুঝিয়াই নেপোলিয়ন বিভিন্ন জার্মান জনপদ, নগর ও দুর্গ হইতে ফরাসী সৈন্যগণকে স্বদেশে ফিরিবার আহ্বান করিলেন। বার্লিন এতদিনে ফরাসী সৈন্যের কবল হইতে মুক্ত হইল। ফ্রেডারিক উইলিয়াম আবার নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইলেন।

নেপোলিয়নের হাতে লাঞ্ছনা ও পীড়নের ফলে প্রাশিয়ার যুবকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ আসে। মস্কো-অভিযানে নেপোলিয়নের বিরাট বিপর্যয়ের কথা জানিতে পারিয়া তাহারা আনন্দে অধীর হয়। ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার তরুণ নেতাদের চেষ্টায় দেশের মধ্যে ব্যাপক সংস্কার ও আধুনিক প্রণালীতে নানারূপ উন্নতি-বিধান করা হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের যে গণ-স্বাধীনতার বাণী সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ইউরোপের জনসাধারণ নেপোলিয়নকে তাহাদের স্বাধীনতার চরম শত্রু বলিয়া মনে করিল। স্পেনবাসী যেমন পূর্বে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল, এখন প্রাশিয়াবাসীও সেইরূপ ফরাসী অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল জার্মানীর মুক্তি-সমর। এই যুদ্ধ তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। প্রাশিয়া এই যুদ্ধে বিশেষ সম্মানের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার তরুণ সৈনিকেরা বীরের মত যুদ্ধ করিয়া অভিজ্ঞ ফরাসী সৈন্যদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিল। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মিলিত বাহিনীও কিন্তু ফরাসী সম্রাটের বিশেষ কোন

ক্ষতি করিতে পারিল না। লুজেন ও বাউজেনের যুদ্ধে নেপোলিয়নেরই জয় হইল। ড্রেসডেনেও সম্মিলিত জাতিসমূহ পরাজিত হইল।

কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর লিপজিগের যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিসমূহের নিকট নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুকার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। জয়লাভের পর সম্মিলিত শক্তি প্যারিস নগরের দিকে অগ্রসর হইল। অবশেষে ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে প্রথম সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। নেপোলিয়ন রাজ্য ত্যাগ করিয়া এল্‌বা দ্বীপে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করিবার পর নেপোলিয়ন গোপনে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলেন। অমনি আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুন নিবিল ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে। নেপোলিয়ন পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন এবং সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন।

সাহিত্য ও দর্শন

নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে যে-যুগের অবসান হইল, জার্মানীর সে-যুগ যে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের দিক দিয়াই স্মরণীয় তাহা নয়। কবি ও দার্শনিকগণের আবির্ভাবও এই সময়ে জার্মান ভূখণ্ডকে ধন্য করিয়াছিল।

ক্লপস্টক, লেসিং, উইলাণ্ড, হার্ডার, গ্যেটে ও শিলার—এই ছয় জন জার্মান কবিই এই রক্তস্নানের ভিতর দিয়া জার্মানীতে আত্ম-

প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্যেটে সমগ্র জগতের মহাকবিগণের মধ্যে অন্যতম, এবং শিলার তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। ফাউস্ট, ইফিজেনিয়া, ট্যাসো প্রভৃতি অমর রচনা গ্যেটের নামকে বিশ্বসাহিত্যে সেক্সপিয়ার ও কালিদাসের সমানই সম্মানিত করিয়া রাখিয়াছে।

দর্শনের দিক দিয়া জার্মানীর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কগুলিরও আবির্ভাব ঘটে এই যুগেই। ক্যান্ট, জ্যাকোবি, ফিক্‌টে, শেলিং ও হিগেল, সর্বশেষে শোপেনহয়ার একের পর এক জার্মান দর্শনের শিরোমণিগণ এই সময়েই জার্মানীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সাম্য-বাদের জনক কার্ল মার্ক্‌সের আবির্ভাবও ঘটে এই যুগে। সঙ্গীত সৃষ্টির দিক দিয়াও এ-যুগ অবিস্মরণীয়। বীথোভেন, মোজার্ট, হেড্‌ন—ইঁহাদের নাম পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকে।


কার্ল মার্ক্‌স

নেপোলিয়নের পতনের পরও তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম দীর্ঘদিন বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন।

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে তাঁহার পরে আর প্রকৃত রাজপদবাচ্য রাজা ইউরোপের কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন

প্রজাদের সুখে সুখী, প্রজাদের দুঃখে দুঃখী। প্রজারা সেকথা কখনও ভুলিয়া যায় নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম। তিনি শক্তিমান্, উচ্চাশাপরায়ণ ও জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিপ্লবের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দেশে এক প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। জনসাধারণ ফ্রান্সের অনুকরণে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি দাবি করিতেছিল।

সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যে সেই দাবি দমন করিবার চেষ্টা করায় রাজার অমাত্যেরা প্রজাদের বিরাগভাজন হইল। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজাকে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে হইল। কিন্তু দেশে আশু শান্তি স্থাপনের কোন আশা দেখা গেল না। দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রাশিয়ায় অশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

বিসমার্ক

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের আহ্বানে অটো ফন বিসমার্ক শোনাউসেন নামক জনৈক পোমেরেনিয়াবাসী অভিজাত ব্যক্তি প্রাশিয়া রাজ্যের শাসন-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন কৃষি-ব্যবসায়ী, তারপর ডায়েট বা পার্লামেন্টের সভ্য হন। তিনি চিরদিন রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চতুর্থ ফ্রেডারিক বিসমার্কের মতবাদ জানিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন।

তাহার পরই রাজা পীড়িত হইয়া পড়েন, ও তাঁহার ভ্রাতা উইলিয়াম রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হন।

এই সময়ে ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট একে একে তাঁহার সমস্ত ইতালীয় অধিকার হইতে বহিষ্কৃত হন। ইহার ফলে জার্মান ভূখণ্ডেও তাঁহার মর্যাদা বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হইল।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যু হইল এবং রাজপ্রতিনিধি উইলিয়াম প্রথম উইলিয়াম নাম গ্রহণ করিয়া প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

এই সময়ে প্রাশিয়ার অধিবাসীদের ভিতর জাতীয়তাবোধ খুবই প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র জার্মানীকে একতার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে—ইহাই ছিল তাহাদের কামনা। এই ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর নেতৃত্ব যে প্রাশিয়াই করিবে, তাহাও তাহারা ধরিয়া লইয়াছিল।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রাশিয়ার লোকেরা জাতি হিসাবে জার্মানীর অন্যান্য অংশের লোকদের মত খাঁটি জার্মান ছিল না। তাহাদের দেহে শ্লাভ বা রুশীয় রক্তের মিশ্রণ ছিল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাবিদ্রোহের ফলে রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক প্রজাদিগকে শাসনকার্যের কতকটা দায়িত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সূত্রেই এখন প্রাশিয়াতে একটা পার্লামেণ্ট বা ডায়েটের অস্তিত্ব ছিল, এবং শাসনকার্যের ব্যয়বরাদ্দ এই পার্লামেণ্ট হইতে অনুমোদন করাইয়া লইবার প্রথাও বলবৎ ছিল। কিন্তু প্রথম

উইলিয়াম সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমরসচিব রুনের আনীত ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাবগুলি পার্লামেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়া দিল।

বিরক্ত হইয়া বিসমার্ক বলিলেন—"পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেরাই রাজ্যশাসন করিব, অন্যথায় শাসনকার্য অচল হইবে।" রাজা বিসমার্কের পরামর্শ অনুযায়ী পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়াই দিলেন।

অসাধারণ রাজনীতিবিদ বিসমার্ক গণতন্ত্রবিরোধী ছিলেন। তাঁহার নীতি ছিল কঠোরতা ও শৃঙ্খলের নীতি (Blood and iron)। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জার্মানী হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে প্রাশিয়া জার্মানীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে নিজের অধীনে আনিতে পারিবে না ও জার্মানীর একতা সাধন করা সম্ভব হইবে না। প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া জার্মানীকে এক মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য বিসমার্ক একে একে ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ডেনমার্কের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত শ্লেজউইগ-হলস্টিন লইয়া প্রাশিয়ার সহিত ডেনমার্কের ঝগড়া বাধিল। ডেনমার্ক সহজেই পরাস্ত হইল। অস্ট্রিয়া প্রথম দিকে প্রাশিয়ার সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। তখন বিসমার্কের পরামর্শে প্রথম উইলিয়াম অস্ট্রিয়ারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অস্ট্রিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইল স্যাক্সনি ও হানোভার।

কিন্তু সুশিক্ষিত প্রাশিয়ান সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইবার সাধ্য ইহাদের কাহারও ছিল না। স্যাক্সনি ও হানোভার দুই-এক সপ্তাহের ভিতর পরাজিত হইল। স্যাডওয়ার যুদ্ধে (১৮৬৬ খ্রীঃ) অস্ট্রিয়ার



আডল্‌ফ হিট্‌লার

[পৃঃ—১০২

ভীষণ পরাজয় হইল। তারপর প্রাশিয়ার বাহিনী ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হইল। হাঙ্গেরীতে তখন বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বাধ্য হইয়া অস্ট্রিয়ার সম্রাট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

অকারণ রক্তপাতে বিসমার্কেরও রুচি ছিল না, তিনি অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন। এমন কি, জার্মানীর দক্ষিণ অংশের রাষ্ট্র-গুলিকে প্রাশিয়ার সহিত মিলিত করিবারও কোন চেষ্টা করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে অল্পদিনের ভিতর উহারা নিজেরাই প্রাশিয়ার সহিত মিশিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। তিনি কেবল হানোভার, স্যাক্সনি প্রভৃতি উত্তর-জার্মানীর রাজ্যগুলিকে প্রাশিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া এবারকার মত ক্ষান্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট্ হইয়া বসিয়াছিলেন। উত্তর-জার্মানীতে প্রাশিয়াকে এইরূপ প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাহা ছাড়া, হোহেনজোলার্ন বংশের এক রাজপুত্রকে এই সময়ে স্পেনের শূন্য সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল। এই রাজপুত্র ছিলেন প্রাশিয়ার প্রথম উইলিয়ামের জ্ঞাতি ভ্রাতা।

নেপোলিয়ন ভাবিলেন যে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে প্রাশিয়া, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেন—এই দুই দিকেই যদি হোহেনজোলার্ন বংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সর্বনাশ হইবে। তাই তিনি এ-বিষয়ে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বাদানুবাদে তিক্ততার সৃষ্টি, অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার ভিতর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

গ্রাভেলোট রণক্ষেত্রে ফরাসীরা পরাজিত হইল। তারপর সম্রাট নেপোলিয়ন নিজেই যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সিডান নগরের সম্মুখে তিনিও পরাজিত হইলেন। প্যারিস নগর জার্মানদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। নেপোলিয়ন রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন; সেখান হইতে তিনি আর ফ্রান্সে ফিরিতে পারেন নাই।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বিজয়ী জার্মানগণ একত্র সমবেত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে অস্ট্রিয়া ব্যতীত সমগ্র জার্মানী এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। এই সাম্রাজ্যের সম্রাট বা কাইজার হইলেন প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম।

উপনিবেশ

বিসমার্কের রাজনীতি সাফল্য-মণ্ডিত হইল। অতঃপর জার্মানীর মনোযোগ সম্পূর্ণভাবেই আফ্রিকার দিকে নিবদ্ধ হইল। টোগো, ক্যামারুন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বৃহৎ এক অংশ একে একে জার্মানীর উপনিবেশে পরিণত হইল।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ শুক্রবার সম্মিলিত জার্মানীর প্রথম সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক উইলিয়াম তখন সান-রেমোতে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। সেখান হইতে বার্লিনে আসিয়া তিনি সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ তখন রোগজীর্ণ। মাত্র তিনমাস পরেই তিনিও

স্বর্গে গমন করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)।

দ্বিতীয় উইলিয়াম তাঁহার পিতা ও পিতামহের মতই বীর ও সাহসী ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মবিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে কাহারও নিকট হইতে নিজের মতের প্রতিবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এই ঘোর অসহিষ্ণুতার ফলে বিসমার্কের সহিতও তাঁহার কলহ সুরু হইল। পূর্ববর্তী সম্রাটেরা কখনও বিসমার্কের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু উইলিয়াম সেভাবে সাম্রাজ্যের শাসনভার একজন মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকার পাত্র ছিলেন না। অগত্যা আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বিসমার্ককে পদত্যাগ করিতে হইল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নব জার্মানীর স্রষ্টা বিসমার্কের মৃত্যু হয়।





উত্থান ও পতন

সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার।
সৃজনের ধ্বংস যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।

—রবীন্দ্রনাথ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁহার পত্নী সার্বিয়া দেশে গিয়াছিলেন প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। সেখানে, সারাজেভো নগরের রাজপথে প্রিন্‌সিপ নামে একজন ছাত্র তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। হত্যার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতির লোক বাস করিত। বহু সংখ্যক সার্ব্‌জাতীয় লোকই সে-সাম্রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী ছিল।

প্রিন্‌সিপ-প্রমুখ রাজনৈতিক আদর্শবাদীদের মত ছিল এই যে অস্ট্রিয়া-বাসী এই সব সার্ব যে-অঞ্চল জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহা সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই মতবাদ উত্থাপন করিয়া অস্ট্রিয়াবাসী সার্বেরা কিছু কিছু আন্দোলনও করিতেছিল। আর্কডিউক এই আন্দোলন থামাইয়া দিবার জন্য এই প্রস্তাব করিলেন যে ঐ সার্ব প্রজাগণকে অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরেই স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হউক।

প্রিন্‌সিপের দল ইহাতে ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা মনে করিল—সার্ব প্রজাগণকে প্রতারণা করিয়া আন্দোলন বর্জনে প্ররোচনা দেওয়া ভিন্ন এই স্বায়ত্তশাসনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। সুযোগ পাইয়া অতিথি যুবরাজকে তাহারা হত্যা করিল। অস্ট্রিয়া অমনি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

সার্বিয়ার অধিবাসীরা হইল শ্লাভ-জাতীয়। সেই সূত্রে শ্লাভজাতির শক্তিকেন্দ্র রাশিয়াতে তাহাদের জন্য বিশেষ সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। রাশিয়ার সম্রাট বিবেচনা করিলেন যে স্বজাতীয় সার্বিয়ানদের রক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য। তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইহাতে জার্মানীর টনক নড়িয়া উঠিল।

বিসমার্কের হস্তে যতদিন শাসনক্ষমতা ছিল, ততদিন তিনি এক-দিকে অস্ট্রিয়ার সম্রাট, অন্যদিকে রাশিয়ার সম্রাট, উভয়ের সহিতই বন্ধুত্ব করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু কাইজার উইলিয়ামের নীতি ছিল অন্যরকম। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কোন প্রয়োজনই বোধ করিলেন না; অস্ট্রিয়ার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কাজেই এই সংগ্রামে জার্মানীকে অস্ট্রিয়ার পক্ষে দেখা গেল।

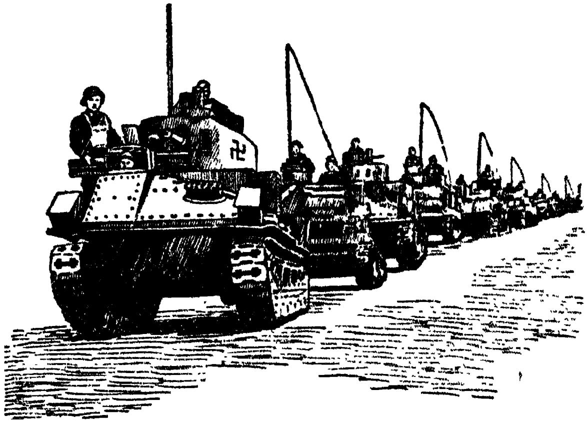
একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের অবসানের পরে জার্মানী আফ্রিকা মহাদেশে নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছিল। এ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দিক দিয়া পৃথিবীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ছিল। এখন পরাক্রান্ত জার্মান জাতিকে এই বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নামিতে দেখিয়া তাহারা বিপদ গণিল। জার্মানীর শক্তিক্ষয় করিতে না পারিলে তাহাদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, এই বিশ্বাসের বশে তাহারা রাশিয়ার সহিত মিলিত হইয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

বহুদিন পর্যন্ত ইংলণ্ড নৌ-শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। জার্মানীর সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আকাশস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি জার্মানীকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করার অভিপ্রায়ে বিরাট নৌ-বহর নির্মাণের দিকে মন দিলেন। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধে যোগদানের ইহাই প্রধান কারণ।

এই যুদ্ধটিকে রণপণ্ডিতেরা আখ্যা দিয়াছিলেন যান্ত্রিক যুদ্ধ। বহু লক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধ উপলক্ষে একত্র মিলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল নানাবিধ অদৃষ্টপূর্ব ভয়াবহ মারণাস্ত্র। ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান, ডুবোজাহাজ প্রভৃতির নির্মাণ-কৌশল বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞগণ পূর্ব হইতেই জানিতেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে শত্রুবিনাশের উদ্দেশ্যে তাহাদের ব্যাপক ব্যবহার ইতিপূর্বে আর হয় নাই।

ইংলণ্ড রণপোতের সাহায্যে জার্মানীর উপকূল ঘিরিয়া ফেলিল,

যাহাতে বাহির হইতে খাদ্য বা অন্য পণ্যদ্রব্য কোনমতে জার্মানীতে আসিতে না পারে। কিন্তু জার্মানীও ডুবোজাহাজের সাহায্যে ইংরেজের জাহাজগুলিকে অনবরত ঘায়েল করিতে লাগিল।



জার্মানীর ট্যাঙ্ক বহর

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান-বাহিনী বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। ফ্রান্সের পূর্ব-সীমান্ত প্রাকৃতিক বাধা ও সুপরিকল্পিত দুর্গশ্রেণীর দ্বারা বিশেষ সুরক্ষিত ছিল। তাই সেদিক দিয়া অগ্রসর না হইয়া উত্তর দিক হইতে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া জার্মানীর সেনা ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হইল। সন্ধি সর্ত অনুযায়ী বেলজিয়াম ছিল নিরপেক্ষ দেশ। কাজেই, তাহারা জার্মানীর এই অগ্রগতিতে বাধা দিল। লীজ, নামুর, আণ্টোয়ার্প, ভার্দুন প্রভৃতি দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া বিনা বাধায় চলিয়া যাওয়া দুর্জয়

জার্মানদের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। কাজেই সর্বপ্রথমে এই দুর্গগুলি অধিকার করারই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘ অবরোধের পর এক একটি দুর্গের পতন হইতে লাগিল। অবশেষে পথ মুক্ত পাইয়া জার্মান-বাহিনী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহারা সেনাপতি জোফ্রের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইল।

ওদিকে জার্মানীতে দেখা দিল অন্তর্বিপ্লব। ইংলণ্ড কর্তৃক সামুদ্রিক অবরোধই ইহার প্রধান কারণ। জার্মানীর মধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়াতে জনসাধারণ জঙ্গীবাদীদের উপর ক্ষেপিয়া উঠিল।

ইতিপূর্বে ইতালী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে, এবং তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। পশ্চিম-এশিয়াতেও যুদ্ধ চলিতেছিল।

রাশিয়ার ভিতরে অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়া যাওয়ায় সেখান হইতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি মিত্রশক্তি আর কোন সাহায্য পাইলেন না। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আমেরিকা মিত্রশক্তির সহিত যোগ দেওয়ার ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শক্তি ও সাহস চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। অক্টোবর মাসে অস্ট্রিয়ার সম্রাট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

আমেরিকার সাহায্যে পুষ্ট মিত্রশক্তি অতি সাহসের সঙ্গে জার্মান-সেনাকে বাধা দিতে লাগিল। সেনাপতি লুডেনডর্ফ পরাজিত হইলেন। ইংরেজ বিমানবহর বার্লিনে বোমা ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন এই সময়ে জার্মানীকে সন্ধি স্থাপনের সুযোগ দিলেন। জার্মানেরাও সে সুযোগ লুফিয়া

জার্মান দেশ—



জার্মান সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ

পৃঃ—১০১

লইল। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নবেম্বর যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদিত হইল।

কাইজার উইলিয়াম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডের দুর্ন নগরে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাকে নিরাপদে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হইল। এদিকে জার্মানীতে সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হইল। ফ্রিজ এবার্ট নামক এক ব্যক্তি হইলেন সেই সাধারণ-তন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। জার্মানীর সমস্ত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিয়া রাইন প্রদেশে মিত্রশক্তির সেনা মোতায়েন করা হইল। যুদ্ধের 'ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্মানীর নিকট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড মিত্রশক্তি দাবি করিয়া বসিলেন।

ভার্সাই সন্ধি

পরাজিত জার্মানীর পক্ষে এই সমস্ত দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে জার্মানী ও মিত্রশক্তির ভিতর চূড়ান্ত ভাবে সন্ধি স্থাপিত হইল। ঐ ৬৬০ কোটি পাউণ্ড বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়া জার্মানগণ সন্ধি ক্রয় করিল। কিন্তু ঐ ঋণ শোধ করার কোন উপায় ছিল না।

ফলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স রূঢ় উপত্যকা আক্রমণ করিল। জার্মানীর কয়লার খনিগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চল জার্মানীর হস্তচ্যুত হওয়ায় খনির শ্রমিকগণ পর্যন্ত কাজ বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিল।

তখন বিজেতাদের মস্তিষ্ক কতকটা শীতল হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে টাকা না থাকিলে কেহ কাহাকেও টাকা দিতে পারে না। জার্মানীর লোক খাইতে পাইতেছে না, তাহারা ঋণ শোধ করিবে কোথা হইতে ? তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে বাঁচিবার সুযোগ দিতে হইবে। জার্মানীর বিনষ্ট শিল্প-বাণিজ্য পুনরুদ্ধার না হইলে জার্মানদের বাঁচিবার আর কোন আশা নাই।

তখন মিত্রশক্তির অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া জার্মানীর অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কমিটি প্রেরিত হইল। এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ডজ নামক একজন ব্যাঙ্কার। এই জন্য কমিটির নাম হইল ডজ কমিটি।

ডজ কমিটি সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শিল্পবাণিজ্য পুনরায় গড়িয়া তুলিবার জন্য জার্মানীকে কিছু ঋণ দেওয়া আবশ্যক। সেই অনুসারে ইংরেজ ও মার্কিন ব্যাঙ্কসমূহ জার্মান দেশে টাকা খাটাইতে ও জার্মান সাধারণ-তন্ত্রকে ঋণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। চরম দুর্দশায় পতিত জার্মান জাতি কতকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হিটলার

এই সময়ে কাইজারের ভূতপূর্ব সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গ নির্বাচিত হইয়াছিলেন জার্মান সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে (১৯২৫ খ্রীঃ)। তাঁকে কতকগুলি রাজনীতিক দলের প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই দলসমূহের ভিতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল ন্যাশনাল সোশালিস্ট দল। সংক্ষেপে ইহাকে নাৎসী দল বলা হইত।

এই দলের সৃষ্টি হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক নগরে। প্রথমে ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল সাতজন মাত্র। ভার্সাই সন্ধি বাতিল করিয়া জার্মানীর পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনাই ছিল এই নাৎসীদের উদ্দেশ্য। দেখিতে দেখিতে দলের প্রাধান্য বাড়িয়া উঠিল। সাতজন মাত্র সদস্য লইয়া যে-দলের পত্তন হইয়াছিল, তাহার জনবল কয়েক বৎসরের মধ্যে দশ লক্ষ ছাড়াইয়া গেল।

সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য আবার যখন নূতন নির্বাচন শুরু হইল, তখন দলের নেতা হিটলারও ঐ পদের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া হিণ্ডেনবুর্গ তাঁহার সহিত একটা আপোষ-রফা করিতে মনস্থ করিলেন। তাহারই ফলে হিটলারকে চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করা হইল (১৯৩৩ খ্রীঃ)।

আডল্‌ফ হিটলারের জন্ম হইয়াছিল অস্ট্রিয়ায়। এক সময়ে তিনি জার্মান সৈন্যদলে সামান্য কর্‌পোরাল ছিলেন। দেশের দুর্গতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি নাৎসী দল গড়িয়া তোলেন। ক্রমে সেনাপতি লুডেনডর্ফের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তিনি বলপূর্বক বার্লিন অধিকার করিবার কল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে সদলে মিউনিক হইতে যাত্রা করিলে পথিমধ্যেই তিনি ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তবে তাঁহাকে বেশী দিন কারাগারে রাখা হয় নাই; কয়েক মাস পরেই মুক্তিদান করা হইয়াছিল।

হিটলারের বাগ্মিতাশক্তি ছিল অদ্ভুত। ঐ বাগ্মিতা দ্বারা তিনি লোকের মন জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র

জনসাধারণেরই একজন। নাৎসী দল ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলে দেশের দারিদ্র্য দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যাইবে, জ্বলন্ত ভাষায় এই সোনার স্বপন দেখাইয়া তিনি দেশের সমস্ত দারিদ্র্য-পীড়িত ব্যক্তিকে নিজের দলে টানিয়া আনিলেন।

চ্যান্সেলারের পদে আসীন হইয়াই হিটলার সমস্ত রাষ্ট্রকে নাৎসী আদর্শে ঢালিয়া সাজাইলেন। জনসাধারণকে উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করিয়া নিজের মতে আনয়ন করার ক্ষমতা তাঁহার খুবই ছিল। ফলে তাঁহার প্রত্যেক প্রস্তাবই জনসাধারণের সমর্থন পাইত। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি সাফল্যের পরে সাফল্য অর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী চ্যান্সেলারের সময়েই রাইন প্রদেশ হইতে মিত্রসেনা অপসারিত হইয়াছিল। হিটলার এখন সেই অঞ্চলে নূতন দুর্গশ্রেণী গড়িয়া তুলিলেন।

ভার্সাই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী জার্মানীর পক্ষে যে-সৈন্যদল রাখা সম্ভব ছিল, তাহা হিটলারের উচ্চাশাকে কার্যে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি ঐ সব সর্ত প্রকাশ্যেই অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। হিটলার দেখিলেন জাতিসংঘের (League of Nations) ভিতর মিত্র-শক্তির এতই প্রাধান্য যে তাহাদের মতের বিরুদ্ধে ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জার্মানীর পক্ষে কোন-কিছু করাইয়া লওয়াই অসম্ভব। তাই তিনি বিরক্ত হইয়া জাতিসংঘ ত্যাগ করিলেন এবং গায়ের জোরেই সার প্রদেশ জার্মানীর সহিত পুনর্মিলিত করিয়া লইলেন। এই সব দেখিয়া জার্মান জনসাধারণ মনে করিতে লাগিল যে হিটলার অমিত-শক্তিধর দৈবপ্রেরিত পুরুষ।

হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিটলার একসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার এই দুই পদই অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার উপাধি হইল ফুরার (Fuhrer)। ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি তিনি পদে পদে ভঙ্গ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সেজন্য কোন প্রতিবাদই ইংলণ্ড বা ফ্রান্স হইতে আসিল না। ফ্রান্স তখন শ্রমিক-ধনিকের বিবাদে বিব্রত। ওদিকে ইংলণ্ডে পর পর এমন কতকগুলি শান্তিপ্রিয় লোক প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইতেছিলেন যে তাঁহাদের পক্ষে বলপ্রয়োগে হিটলারকে নিরস্ত করার কল্পনাও ছিল বেদনাদায়ক।

কিন্তু অবশেষে হিটলার এমন একটি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিলেন যে পরম শান্তিপ্রিয় ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনও বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

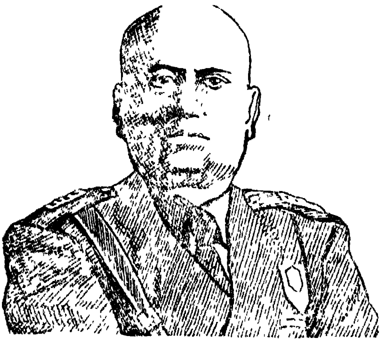
হিটলার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অতি-অকস্মাৎ অস্ট্রিয়া আক্রমণ করিয়া উহা জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি তখন এতই হীন হইয়া পড়িয়াছে যে যান্ত্রিক সমর-সজ্জায় সুসজ্জিত জার্মান বাহিনীর সম্মুখে এক মুহূর্তের প্রতিরোধ খাড়া করিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

মিউনিক চুক্তি

অতঃপর হিটলারের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইল চেকো-শ্লোভাকিয়ার উপরে। এই রাজ্যের অন্তর্গত সুদেতেনল্যাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল জার্মান জাতীয়, কাজেই তাহাদিগকে জার্মানীর প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে না আনা পর্যন্ত হিটলারের শান্তি নাই। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স

সকলকেই ডাকিয়া বলিলেন যে সুদেতেনল্যাণ্ডটি যদি তাঁহাকে দিয়া দেওয়া হয়, তবে তিনি ভবিষ্যতে আর কোন জনপদ গ্রাস করিবার চেষ্টা করিবেন না।

হিটলারের এই আশ্বাসবাক্যে প্রতারিত হইয়া চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের মিউনিকে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হিটলারের ইতালীয় বন্ধু ফাসিস্ত ডিক্টেটর মুসোলিনিও এই মন্ত্রণায় যোগ দিবার জন্য আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের ওপার হইতে আসিয়া পড়িলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহাই মিউনিক চুক্তি নামে খ্যাত।



মুসোলিনি

হিটলারের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, এবং ইংরেজ ও ফরাসী মন্ত্রীরাও এই চিন্তা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন যে যেভাবেই হউক, তাঁহারা শান্তিরক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-শান্তি কিছুতেই রক্ষা পাইল না। সুদেতেন-ল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব লাভ করিবার কয়েক মাস পরেই হিটলারের সৈন্য চেকো-শ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ অধিকার করিল। হিটলার পোল্যাণ্ডের নিকট হইতেও একটা রাজ্যখণ্ড দাবি করিয়া বসিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড রাজ্য পুনর্গঠিত করিয়া ড্যানজিগ

বন্দরে বাহির হইবার জন্য পোল্যাণ্ডকে একটা পথ দেওয়া হইয়াছিল। এই অপ্রশস্ত দীর্ঘ ভূখণ্ডকে বলা হইত 'পোলিশ করিডর' বা 'পোল্যাণ্ডের পথ'। এই ভূখণ্ডটি জার্মান রাষ্ট্রেরই অংশ হইতে লওয়া হইয়াছিল।

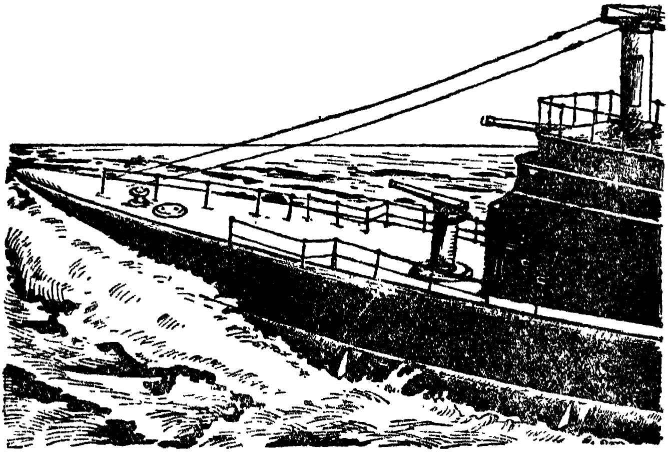
এক্ষণে হিটলার এইটি ফিরাইয়া চাহিলেন। এবারে চেম্বারলেন-দালাদিয়েরের চৈতন্য হইল। তাঁহারা পোল্যাণ্ডকে বলিয়া পাঠাইলেন যে হিটলারের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁহারা পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবেন। সেই উৎসাহ-বাণীতে সাহস পাইয়া পোল্যাণ্ড হিটলারের দাবি স্বীকারে অসম্মত হইল। ফলে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের বিমান বাহিনী পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্সতে আকাশ-যুদ্ধ চালাইল। দুইদিন পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত জিডনিয়া বন্দর অধিকার করিয়া জার্মান-সেনা ওয়ার্স রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল। ও-দিকে একান্ত আকস্মিক-ভাবে এক বিরাট রুশবাহিনী পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্তে উপনীত হইল। রাশিয়ার সহিত জার্মানীর একটা মৈত্রীবন্ধন পূর্ব হইতেই ছিল বটে, কিন্তু সেই সন্ধির মর্যাদারক্ষার জন্যই যে অযাচিতভাবে রুশ-সৈন্য পোল্যাণ্ডে হানা দিয়াছিল, তাহা নহে। রাশিয়া জানিত যে প্রবল পরাক্রান্ত হিটলারের পক্ষে পোল্যাণ্ড অধিকার করিয়া লওয়া অতি সহজ কাজ। সেরূপ ঘটনা ঘটিলে রাশিয়াও যাহাতে পরাজিত

পোল্যাণ্ডের কতকটা অংশ দখল করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই-ভাবে পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

দুইদিকে দুই প্রবল শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পোল্যাণ্ড আত্ম-সমর্পণ করিল এবং সমস্ত রাজ্যটাই জার্মানী ও রাশিয়ার ভিতর মোটামুটি বিভক্ত হইয়া গেল।



ইউ-বোট জাতীয় ডুবোজাহাজ

অতঃপর হিটলার ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের দিকে মন দিলেন। সমুদ্রে ইংলণ্ড চিরদিনই অপরাজেয়। এই প্রবল নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা ইউ-বোট জাতীয় ডুবোজাহাজ তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ইহাদের আক্রমণে শত শত ব্রিটিশ জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ইউ-বোট-বিধ্বংসী জল-

জার্মান দেশ-



নাৎসী দলের সাথে হিটলার।

[পৃঃ—১০২

বোমা (ডেপ্‌থ-চার্জ) আবিষ্কার করিয়া ইংলণ্ড নিজের নৌ-বাহিনীকে এই সাংঘাতিক বিপদের হাত হইতে অনেকাংশে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী একসময়ে যেমন কাইজারের জার্মানীকে অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, এবার হিটলারের জার্মানীকেও সেইভাবে ঘেরিয়া রাখিল। ফলে শীঘ্রই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল।

জার্মান-সেনা এইবার হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক আক্রমণ করিল। হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করাই হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল। নরওয়েতেও যুদ্ধ চলিল। সেখানে সাহায্য পাঠানো ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব হইল না। নরওয়ে হিটলারের পদানত হইল। ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। চার্চিল নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন করিলেন।

ডানকার্ক

মিউজ-নদী পার হইয়া জার্মান সেনা ফরাসীগণকে আক্রমণ করিল। দি হেগ, আমস্টার্ডাম প্রভৃতি নগর হিটলারের পদানত হইল। জার্মানগণ ফরাসীদেশের সীমান্তে উপনীত হইল। লর্ড গর্টের অধীনে ইংরেজ-সেনা অবরুদ্ধ হইবার মত অবস্থায় পতিত হইল। সেই সেনার সংখ্যা তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার। ডানকার্ক বন্দর হইতে দিবারাত্রি জাহাজভর্তি ইংরেজ-সৈন্য ইংলণ্ডে পলায়ন করিতে লাগিল। ছয়দিনের ক্রমাগত পারাপারের ফলে সমুদয় ইংরেজ-বাহিনী শত্রুর আয়ত্তের বাহিরে পলায়নে সমর্থ হইল।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুন জার্মান-বাহিনী প্যারিস নগরে প্রবেশ করিল। প্রায় সমগ্র দেশটিই হিটলারের অধিকারভুক্ত হইল। সামান্য একটু ভূখণ্ডের উপর ফরাসী পতাকা উড্ডান করিয়া ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মার্শাল পেতঁ্যা ভিচী নগরে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন। বলা বাহুল্য, এই গবর্ণমেণ্টও সম্পূর্ণরূপে হিটলারের আজ্ঞাবহ ছিল।

চীন ও আমেরিকা

ইংলণ্ডে দিবারাত্রি ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান উড়িতে লাগিল। বোমাবর্ষণে অর্ধেক ইংলণ্ড বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর চীন এবং ১১ই ডিসেম্বর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ইতিমধ্যে জার্মানী, ইতালী ও জাপানের ভিতর দশ বৎসরের জন্য এক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। গ্রীস, ক্রীট ও আফ্রিকাতেও মিত্রশক্তির সহিত অক্ষশক্তির (জার্মানী, ইতালী ও জাপান) সংঘর্ষ বাধিল।

রাশিয়া

রাশিয়ার সহিতও জার্মানীর সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ২২শে জুন (১৯৪১ খ্রীঃ) জার্মান সৈন্যগণ আকস্মিকভাবে রাশিয়া আক্রমণ করিল। লেনিনগ্রাড, মস্কো ও স্টালিনগ্রাডে দীর্ঘদিন ধরিয়া ভয়াবহ

সংগ্রাম চলিল। রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াই বিশ্বজয়ী নেপোলিয়ান নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। হিটলারও সেই ভুল করিয়া বসিলেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি রাশিয়ার প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে পারিলেন না।

এদিকে রাশিয়ার দক্ষিণে ক্রিমিয়াতে, এবং আফ্রিকার মরুমধ্যে লিবিয়াতে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। ককেশাস পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চলে জার্মানদের পরাজয় হইল। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকেই বুঝিতে পারা গেল যে জার্মান শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

ইতালী

ইতালীর জনসাধারণ ডিক্টেটর মুসোলিনির উপর অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিটলারের সহিত নিজের ভাগ্য জড়িত করিয়া তিনি ইতালীর উপর ঘোর বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন, এজন্য ইতালীবাসীরা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিল। মুসোলিনি ধৃত ও বন্দী হইলেন। মার্শাল বাদোগলিয়ো নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক মতে দেশশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে জার্মান-সেনা ক্রমশঃ পশ্চাতে সরিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে জার্মানেরা হিটলারের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিল। হিটলারের প্রাণনাশেরও চেষ্টা হইল, কিন্তু প্রতিবারই কোনক্রমে তিনি রক্ষা পাইতে থাকিলেন।

মার্শাল পেত্যাঁর ভিচী-গবর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করিয়া জেনারেল

দ্য'গল ফ্রান্সে নূতন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনে সমর্থ হইলেন (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর)। মার্কিন সৈন্যের আক্রমণে জার্মানেরা প্যারিস ও ফ্রান্সের বিভিন্ন অংশ হইতে বিতাড়িত হইল। নানাদিক হইতে মিত্রশক্তির অনেকগুলি বাহিনী জার্মানীর ভিতরে ঢুকিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল।

ওদিকে রুশ-সৈন্যও আসিয়া পড়িয়াছে। ওডার নদীর তীরে হিটলার শেষ বার তাহাদিগকে প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন। তাহাতেও অকৃতকার্য হইয়া তিনি ভগ্নহৃদয়ে বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন। ২৯শে এপ্রিল (১৯৪৫ খ্রীঃ) তিনি আত্মহত্যা করিলেন। রুশসেনা তখন বার্লিন নগরে বিজয়গর্বে প্রবেশ করিয়াছে।

হিটলারের পরিত্যক্ত শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিবার মত লোক জার্মানীতে তখন কেহই ছিল না। যাহা হউক, মিত্রশক্তির হস্তে আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্যও একজন কাহাকেও রাষ্ট্রনায়ক পদে অভিষিক্ত করার প্রয়োজন ছিল। অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস এই অপ্রিয় কর্তব্যের ভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া দিবার পরই ডোয়েনিৎস মিত্রশক্তির হস্তে বন্দী হইলেন।

বার্লিন এবং সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রের শাসনভার সম্মিলিতভাবে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই চতুঃশক্তির হাতে গিয়া পড়িল। সেই শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য রাশিয়া

কর্তৃক মনোনীত হইলেন মার্শাল জুকভ, এবং অন্য তিন শক্তি সমবেতভাবে নিযুক্ত করিলেন মার্কিন সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে। সমগ্র দেশ পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত হইল; পূর্বাংশের শাসনভার রুশেরা এবং পশ্চিমাংশের শাসনভার অন্য ত্রিশক্তি গ্রহণ করিল। রাজধানী বার্লিনকেও দ্বিখণ্ডিত করা হইল।

হিটলারের সহকারী নাৎসী নেতাদের অনেকেই বন্দী হইয়াছিলেন। নুরেমবার্গের বিশেষ বিচারালয়ে তাঁহাদের বিচার হয়। সকলের উপরেই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়। কেহ বা দীর্ঘদিনের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, কেহ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জার্মানীর পুনর্গঠন ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এখন একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন দল এবং অপরদিকে সোভিয়েট রাশিয়া—দুই প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে ভীষণ মন কষাকষি চলিতেছে। দুই দলই নিজেদের সুবিধা অনুসারে আবার জার্মানীকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল লইয়া সম্মিলিত পশ্চিম-জার্মানী রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং জার্মানীর পূর্বভাগ লইয়া পূর্ব-জার্মানী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। পশ্চিম-জার্মানীর চ্যান্সেলারের নাম ডাঃ কনরাড আডেনাউয়র। বন শহর পশ্চিম-জার্মানীর কেন্দ্রস্থল। পূর্ব-জার্মানী রাষ্ট্রের সভাপতির নাম হের উই[illegible] পিয়েক। বার্লিন ইহার শাসনকেন্দ্রস্থল।

আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীকে শক্তিশালী করিয়া পশ্চিম-ইউরোপ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও উত্তর আটলান্টিক সংঘের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চায়। অপর পক্ষে রাশিয়া পূর্ব-জার্মানীকে তাহার দলভুক্ত পূর্ব-ইউরোপ শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।

শেষ